উচ্চ মাধ্যমিক

বাংলা সংকলন

সৃজনশীর প্রশ্নপদ্ধতি অনুশীলন গ্রন্থ

প্রশ্নের আলোকে রচিত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক।

উচ্চ মাধ্যমিক

বাংলা সংকলন

[একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য]

সংকলন ও রচনা

ড. মাহবুবুল হক

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ

পরিমার্জিত সংস্করণ

ড. সরকার আবদুল মান্নান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

http://boiaddaa.org

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জুলাই, ১৯৯৮
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : আগষ্ট, ২০০১
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : জুন, ২০০৭
পূর্ণমুর্দ্রণ -জুন ২০০৮
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১১

কম্পিউটার কম্পোজ
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রাঃ) লিঃ

প্রচ্ছদ
নজরুল ইসলাম দুলাল

ডিজিটাল সংস্করণ
ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স
তত্ত্বাবধায়ক
বুলবুল আহমেদ

মূল্য : ৭০.৮০ (সত্তর টাকা আশি পয়সা) মাত্র।

মুদ্রণে : দোহার প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ আর. এম. দাস রোড

প্রসঙ্গ কথা

সুশিক্ষিত জাতি গঠনে সাহিত্যপাঠ অতীব জরুরি। সাহিত্য অধ্যয়নে শিক্ষার্থীর মধ্যে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় রুচিবোধ, মননশীলতা ও জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। এছাড়া শিক্ষার্থীর সৃজনশীল মেধা ও মননের বিকাশেও সাহিত্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। এসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে ২০০৭–২০০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত কলেবরের এই বাংলা সংকলনটি প্রকাশিত হল। এ গ্রন্থটিকে সহজলভ্য, বহনযোগ্য ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকে পাঠ্যসূচি নির্দেশিত ১১টি গল্প–প্রবন্ধ এবং ১০টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই স্বল্প পরিসরের মধ্যেই ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের ইতিহাস–ঐতিহ্য, সংস্কার–সংস্কৃতি এবং আমাদের জীবনের বিচিত্র বিন্যাস ও ব্যাপ্তি। পাশাপাশি সাহিত্যপাঠে শিক্ষার্থীদের আনন্দ লাভের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা। ৫২-র ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এ ভাষাকে কেন্দ্র করে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন বিশ্বপরিসরে ব্যাপ্ত। সুতরাং এখন এ ভাষার ব্যবহারিক দিকে ব্যুৎপত্তি অর্জন যেমন প্রয়োজন তেমনি সৃষ্টিশীলতায় দক্ষতা ও কুশলতা অর্জনও গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিবেচনায় রেখে সংকলনটিতে বিস্তৃত পরিসরে বাংলা ভাষার গড়ন-সৌষ্ঠব ও ব্যবহারিক বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু করে তোলার জন্য সাহিত্যের বিচিত্র শাখা–প্রশাখার স্বরূপ-প্রকৃতিও প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরব, আমাদের প্রেরণা। শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের এ গৌরবময় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বেশ কয়েকটি গল্প-কবিতা। এ ছাড়া গদ্যাংশে এইডস ও দুর্নীতি বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের নির্দেশনা নিয়ে দুটি রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সংকলনটিতে পাঠ্যসূচি, মানবণ্টন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা সংযুক্ত করা হয়েছে।

এ বইয়ের সংকলক, সম্পাদক এবং সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ বইটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে যাদের জন্য 'উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন' বইটি প্রকাশ করা হল তারা উপকৃত হলেই আমাদের সমস্তপ্রয়াস সার্থক হবে।

প্রফেসর ড. মোঃ মছির উদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

সূচিপত্র

গদ্য			
ক্রমিক	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কমলাকান্তের জবানবন্দি	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬
২.	হৈমন্তী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪
৩.	সাহিত্যে খেলা	প্রমথ চৌধুরী	৩৫
৪.	বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৩
৫.	অর্ধাঙ্গী	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	৬৪
৬.	যৌবনের গান	কাজী নজরুল ইসলাম	৭৬
৭.	কলিমদ্দি দফাদার	আবু জাফর শামসুদ্দীন	৮৫
৮.	একটি তুলসী গাছের কাহিনী	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	৯৬
৯.	একুশের গল্প	জহির রায়হান	১০৯
১০.	দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ	সংকলিত রচনা	১১৮
১১.	অপরাহ্নের গল্প	হুমায়ূন আহমেদ	১২৮

কবিতা			
ক্রমিক	কবিতার শিরোনাম	কবি	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বঙ্গভাষা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৩৬
২.	সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৩
৩.	জীবন-বন্দনা	কাজী নজরুল ইসলাম	১৪৯
৪.	বাংলাদেশ	অমিয় চক্রবর্তী	১৫৫
৫.	কবর	জসীমউদ্‌দীন	১৬২
৬.	তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	১৭৬
৭.	পাঞ্জেরি	ফররুখ আহমদ	১৮৩
৮.	আমার পূর্ব বাংলা	সৈয়দ আলী আহসান	১৮৯
৯.	আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	১৯৬
১০.	একটি ফটোগ্রাফ	শামসুর রাহমান	২০৩

প্রশ্নের ধরন ও মানবণ্টন

বাংলা : প্রথম পত্র

১. গদ্য = ৪৪

(ক) সৃজনশীল প্রশ্ন ৩ টি থেকে ২ টির উত্তর দিতে হবে। ২×১০=২০

(খ) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ২৪ টি, প্রত্যেকটির উত্তর দিতে হবে। ১×২৪=২৪

মোট = ৪৪

২. কবিতা = ৩৬

(ক) সৃজনশীল প্রশ্ন ৩ টি থেকে ২ টির উত্তর দিতে হবে। ২×১০=২০

(খ) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ১৬ টি, প্রত্যেকটির উত্তর দিতে হবে। ১×২৪=১৬

মোট = ৩৬

৩. উপন্যাস = ২০

(ক) সৃজনশীল প্রশ্ন ৩ টি থেকে ২ টির উত্তর দিতে হবে। ২×১০=২০

সর্বমোট = ১০০

http://zoaddar.org

কমলাকান্তের জবানবন্দি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বাংলা উপন্যাসের জনক ও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্য সম্রাট' হিসেবেও অভিহিত হয়ে থাকেন। 'বঙ্গদর্শন' নামে যে বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এবং শক্তিশালী লেখক সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। যুগন্ধর এই সাহিত্য–স্রষ্টার বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ' ইত্যাদি।

'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রথম প্রকৃত বাংলা উপন্যাস।

মননশীল প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য কুশলতার পরিচয় রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'সাম্য'।

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান সৃষ্টিশীল লেখকদের একজন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকদের একজন। পেশায় তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়ায় এবং তাঁর মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে।

সেই আফিংখোর কমলাকান্তের অনেকদিন কোনো সংবাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম। অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারি আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছেন। মনে করিলাম, আর কিছু না ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিং চুরি করিয়াছে–অন্য সামগ্রী কমলাকান্তচুরি করিবে না–ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্তা কনস্টেবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না–কি জানি যদি কমলাকান্তজামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কী হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনস্টেবল রশি ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্মাবতার–পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে–সাক্ষী। মোকদ্দমা গরু চুরি। ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী। কলমাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশি ধমকাইলেন–"হাস কেন?"

কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে ?" চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাশার জায়গা এ নয়–হলফ পড়।" কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ....."

কমলাকান্ত (সবিস্ময়ে) কী বলিব?

মুহুরি। শুনতে পাও না–"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে–"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কী সর্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কী একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্বনাশ কী?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি–এ কথাটা বলতে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কী? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম–কিন্তু গোড়াতেই একটা মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কী?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "এত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর পাইতেছি না–তখন কেমন করিয়া বলি–আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে–"

ফরিয়াদির উকিল চটিলেন- তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকিল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়! Theological Lecture টা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকিল।"

উকিল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি–যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকিল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "O Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকিলবাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না–সুতরাং উকিলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে–উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও–বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি–বল।"

কমলা। কী প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্মাবতার! সাক্ষী বড় সের্‌কশ্।"

উকিলবাবু হাঁকিলেন, "Very obstructive."

কমলাকান্ড় (উকিলের প্রতি) সাদা কাগজে দস্ত্খত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাইরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি?

উকিল। সাদা কাগজে কে তোমার দস্ত্খত লইতেছে?

কমলা। কী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কী লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া দস্ত্খত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।"

মুহুরি তখন বলিলেন, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোনো কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কী?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ড়তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকিলবাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্ড়কে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদমায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর বলিতে পাইব না?

উকিল। না।

কমলাকান্ড়তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, কোনো কথা গোপন করিব না।' ধর্মাবতার বেআদবি মাফ হয়। পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকিলবাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন; তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ড় তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহৎ খুব।" উকিল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন "তোমার নাম কী?

কমলা। শ্রীকমলাকান্ড়চক্রবর্তী।

উকিল। তোমার বাপের নাম কী?

কমলাকান্ড়পিতার নাম বলিল। উকিল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কী জাতি।"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকিল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকিল। আঃ! কোন বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকিল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকিলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কৈবর্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান তা—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্মাবতার! এ উকিলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্তী — ইহাতেও যে উকিল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কী প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

এজলাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত্ বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস, তেরদিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—"

উকিল। কী জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন, এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোনো কথা গোপন করিব না।

উকিল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথায়?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকিল। বলি, বাড়ি কোথায়?

কমলা। বাড়ি দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারিও নাই।

উকিল। তবে থাক কোথায়?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকিল। একটা আড্ডা ত আছে?

কমলা। ছিল, যখন নসীবাবু ছিলেন, এখন আর নাই।

উকিল। এখন আছ কোথায়?

কমলা। কেন এই আদালতে।

উকিল। কাল ছিলে কোথায়?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তার পর?"

উকিল। তোমার পেশা কী?

কমলা। আমার আবার পেশা কী? আমি কি উকিল যে, আমার পেশা আছে।

উকিল। বলি খাও কী করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকিল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকিল। কিছু উপার্জন কর?

কমলা। এক পয়সাও না।
উকিল। তবে কি চুরি কর?
কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্বেই আপনার শরণাগত হইতে হত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকিল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জবানবন্দি করাইতে পারিব না।"

শব্দার্থ ও টীকা

ফৌজদারি আদালত	-	যে আদালতে বা বিচারালয়ে ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় মামলা পরিচালিত হয়।
এজলাস	-	বিচারকক্ষ।
ডেপুটি	-	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।
কাটারা	-	কাঠগড়া।
মুহুরি	-	উকিলের কাজে সহায়তাকারী লেখক।
ফারম	-	ফর্ম। Form.
ধর্মাবতার	-	বিচারককে সম্বোধন বিশেষ। ধর্ম বা ন্যায়ের মূর্তিমান রূপ।
Theological Lecture	-	ধর্মতত্ত্বীয় বক্তৃতা।
ব্রাহ্মসমাজ	-	রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৮৩) প্রবর্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭–১৯০৫) প্রমুখ প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়।
শামলা	-	উকিলের পোশাক হিসেবে ব্যবহৃত শালের পাগড়ি।
ওথ	-	হলফনামা, শপথ–বাক্য। oath।
Simple affirmation	-	সহজ হলফনামা।
সেরকশ্	-	বেয়াড়া, উদ্ধত, একরোখা, একগুঁয়ে।
Obstructive	-	বাধাসৃষ্টিকারী। ঝামেলার।
ওঁ	-	ঈশ্বরবাচক ধ্বনি।
মধু	-	এখানে সুর (অথবা ব্যঙ্গে টাকাকড়ি) বোঝাতে ব্যবহৃত।
অধিকারী	-	যাত্রাদলের মালিক বা পরিচালক।
বহৎ খুব	-	বেশ ভাল। প্রশংসাসূচক ধ্বনি।
বর্ণ	-	উকিল জানতে চেয়েছেন। হিন্দু সমাজের সামাজিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে কমলাকান্তের জাতিসম্প্রদায় কী। আর কমলাকান্ত বর্ণ অর্থে রং ধরে নিয়ে জবাব দিয়েছে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।
যজ্ঞোপবীত	-	যজ্ঞসূত্র, উপবীত, পৈতা।
কুঠারি	-	ছোট কামরা, খোপ।
শরণাগত	-	আশ্রয়প্রার্থী বা আশ্রয়প্রাপ্ত।
জবানবন্দি	-	বিচারকের কাছে প্রদত্ত বিবৃতি।

উৎস ও পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়। এটি বঙ্কিমের বিখ্যাত রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর'—এর সর্বশেষ রচনা। রচনার নির্বাচিত অংশবিশেষ এখানে সম্পাদিতভাবে সংকলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাটির মূল শিরোনাম ছিল: 'কমলাকান্তের জোবানবন্দি'।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনাগুলোর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক ধরনের হাস্যরসাত্মক রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনার প্রচলন করেছিলেন, যার ভেতর দিয়ে তিনি পরিহাসের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা এবং সাহিত্য—সংস্কৃতির নানা ত্রুটি—বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটি নকশা জাতীয় অভিনব রচনা। এটি বঙ্কিম সাহিত্যের অন্যতম চমকপ্রদ সম্পদ। এখানে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষী কমলাকান্তের জবানবন্দির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন আদালতে সাজানো—গোছানো যে গালভরা কারবার চলে তা অনেকাংশেই কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু চুরির মামলার সাক্ষী আফিং-এর নেশায় কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ কমলাকান্তকে জেরা করতে গিয়ে উকিল যেভাবে পদে পদে বিব্রত ও নাকাল হয়েছেন, তাতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। উকিল বাবু কমলাকান্তকে যতই উন্মাদ মনে করুন না কেন, তার প্রচ্ছন্ন শ্লেষাত্মক উক্তিগুলো বাস্তব সত্যের আলোয় আমাদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে।

আপাতদৃষ্টিতে কমলাকান্তের আচরণ ও কথাবার্তা অনেকখানি পাগলামির সামিল। সে আফিং খায়, বসে বসে ঝিমায়, নানা উদ্ভট কথা বলে। কিন্তু নেশাখোর ও বাতিকগ্রস্তের চেহারা ও অসংলগ্ন কথাবার্তার আড়ালে রয়েছে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীল জীবনদৃষ্টি। তা আমাদের চারপাশের নানা রুচি ও অসঙ্গতিকেই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

এই রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকরস সৃষ্টিতে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

সাহিত্যবোধ ❑ নকশা

একটা দালানের ছবি যখন ক্যামেরায় ধরা পড়ে তখন তাকে বলি আলোকচিত্র। আর নকশাকার যখন গৃহনির্মাণের প্রাথমিক খসড়া রেখাঙ্কিত করে তৈরি করেন তখন তাকে বলা হয় নকশা।

তেমনি গল্প—উপন্যাসের মতো বিস্তৃত ও গভীর তাৎপর্যময় ছবি না এঁকে লেখক যখন তার খসড়া একটা ছবি আঁকেন স্বল্প কিছু রেখায়, তখন তাকে বলা হয় নকশা।

'কমলাকান্তের জবানবন্দি'ও এ ধরনের নকশা জাতীয় হালকা সরস রচনা। এখানে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষীকে উকিলের জেরার একটা চালচিত্র বা চিত্রধর্মী বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

আপাতদৃষ্টিতে এখানে কোনো গভীর—দর্শন দেখা যায় না। কিন্তু হালকা রসালো কথাবার্তার ভেতর দিয়ে তৎকালীন আদালতের বিচার ব্যবস্থার অসঙ্গতির দিকটিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সাহিত্যবোধ ❑ বাগ্‌বৈদগ্ধ (Wit)

অনেক সময় কথাবার্তায় থাকে বুদ্ধির চমক ও দীপ্তি। তা এমন এক অপ্রত্যাশিত অর্থ প্রকাশ করে যে, তাতে আমরা হাস্যরস অনুভব করি। একে বলা হয় বাগ্‌বৈদগ্ধ। যে কোনো বিষয় নিয়ে চকিত ও সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যের মধ্যেও বাগ্‌বৈদগ্ধের প্রকাশ ঘটতে পারে। 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় উকিলের জেরার জবাব এ ধরনের বাগ্‌বৈদগ্ধপূর্ণ।

গরু চুরি মামলার সাক্ষী কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় ঢোকানো হলে কমলাকান্তবলেছেন, 'বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?' এখানে কমলাকান্তসাক্ষীর কাটরাকে খোঁয়াড় কল্পনা করেছেন। ফলে স্বভাবতই তাঁর সম্পর্কে আমাদের সাক্ষীর বদলে 'গরু' কথাটাই মনে আসে এবং এর ফলে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

এরকম :

উকিল। তুমি কী জাতি?

কমলা। আমি কী একটা জাতি?

উকিল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকিল। আঃ! কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

ভাষা অনুশীলন ❑ বাক্যের প্রকার পরিবর্তন

এক প্রকার বাক্যকে মূল অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে অন্য প্রকারের বাক্যে পরিণত করাকে বলা হয় বাক্যের প্রকার পরিবর্তন বা বাক্য পরিবর্তন। যেমন:

সরল বাক্য	:	ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী।
জটিল বাক্য	:	যে ফরিয়াদি, সে প্রসন্ন গোয়ালিনী।
সরল বাক্য	:	সাক্ষীটা কী একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে।
জটিল বাক্য	:	যে সাক্ষী সে একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে।
সরল বাক্য	:	আমার নিবাস নাই।
জটিল বাক্য	:	যা নিবাস, তা আমার নাই।
সরল বাক্য	:	তোমার বাপের নাম কী?
জটিল বাক্য	:	তোমার যিনি বাপ, তার নাম কী?
সরল বাক্য	:	আমি এ সাক্ষী চাই না।
জটিল বাক্য	:	যে সাক্ষী এ রকম, তাকে আমি চাই না।

বিচার–কাজের সঙ্গে যুক্ত শব্দ

নিচের (ক) গুচ্ছে শব্দগুলোর ইংরেজি পরিভাষা (খ) গুচ্ছ থেকে বেছে নাও।

ক. ফৌজদারি আদালত, আদালত, জামিন, এজলাস, হাকিম, আসামি, ফরিয়াদি, সাক্ষী, হলফ, মুহুরি,উকিল, জবানবন্দি।

খ. The court-room, bail, compleainant, criminal court, legal, statement, judge, witness, court, accused, oath, clerk, lawyer.

বানান সতর্কতা

ব্রাহ্মণ, সামগ্রী, সাক্ষী, সাক্ষ্য, প্রত্যক্ষ, ব্রাহ্ম।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কমলাকান্তকোন পরিচয়ে আদালতে এসেছেন?

ক. ফরিয়াদি খ. আসামী
গ. সাক্ষী ঘ. উকিল

২. 'পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া' বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থ-

i. বিশ্বাস রাখা
ii. সরাসরি দেখা
iii. উপস্থিতি উপলব্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. 'যেই সাক্ষী এই রকম, তাহাকে আমি চাহি না'-এই জটিল বাক্যটির সরল এবং চলিত রূপ কোনটি?
ক. যে সাক্ষী এরকম তাকে আমি চাহি না।
খ. আমি এ রকম সাক্ষী চাই না।
গ. আমি এই সাক্ষী চাহি না।
ঘ. আমি ও সাক্ষী চাই না।

৪. **অনুচ্ছেদটি পড় ৪ এবং ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:**
বন্যাপ্লাবিত এলাকার ত্রাণপ্রার্থী লোকদের ধৈর্য ধরার জন্য স্থানীয় সেবাসংস্থার পরিচালকের লম্বা-চওড়া বক্তব্য শেষ হল। বয়স্ক স্কুল শিক্ষক ক্ষুব্ধকণ্ঠে উচ্চস্বরে বললেন, "আপনার রচনামৃত আমাদের জঠরাগ্নি বা তেষ্টা কোনোটি মেটাতে সমর্থ নয়। এমনি কি শুকনো উপদেশের চিড়া ভেজানোর মতো পানির বড্ড অভাব।

৫. অনুচ্ছেদের শিক্ষকের সংলাপে কমলাকান্তের কথোপকথনের কোন দিকটি প্রধানভাবে ফুটে উঠেছে?
ক. কৌতুক　　খ. শ্লেষ
গ. চমক　　ঘ. হেঁয়ালি

৬. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' এর যে বক্তব্য অনুচ্ছেদটিতে ফুটে উঠেছে তা হল-
i. সমাজের অসংগতি　　ii. বিচার ব্যবস্থার অসারতা
iii. অনুষ্ঠান সর্বস্বতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দৌলতপুরের ধনাঢ্য ব্যক্তি দৌলত খাঁয়ের চলিশ্শা উপলক্ষে দরিদ্রভোজন ও বস্ত্রদানের বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। খাঁয়ের ভাগ্নে এহসান তদারকি করছে। অনুষ্ঠানের শেষাংশে খাদ্য-বস্ত্রের ঘাটতি দেখা গেল। এহসান মিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করে চিৎকার করে উঠল, 'হাজার লোকের আয়োজন, তেরশকে খাওয়ালাম। গাঁয়ের সবলোকই দেখছি গরিব।' ষাটোর্ধ রায়হান মিয়া জবাব দিলেন, 'আমরা দীনহীন, তাতে সন্দেহ কি? দেখলাম এহসান মিয়ার বাড়ির দিকে কামলারা খাবারের ডেকচি আর কাপড়ের গাট্টি নিয়ে যাচ্ছে। আজকের দিনে এহসান মিয়াই তো দীনের চেয়ে দীন। চলরে সবাই, বাড়ি যাই।'
ক. 'যজ্ঞোপবীত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
খ. 'বলি খাও কী করিয়া?'- সংলাপটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. কমলাকান্তের কোন বৈশিষ্ট্য রায়হান মিয়ার চরিত্রে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উপরের অনুচ্ছেদটি 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনাটির ভাবার্থের দর্পণ।'-মন্তব্যটি যাচাই কর।

২. তারাগঞ্জ গ্রামে চৌধুরী সাহেবের নামে এতিমখানার ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। এলাকার গণ্যমান্য, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও তাতে সামিল হয়েছেন। চৌধুরী সাহেব এতিমদের নিজ হাতে পরিবেশন করছেন,- হাততালির সঙ্গে ক্লিক ক্লিক করে ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলতে লাগলো। অন্যদিকে বহুব্যঞ্জন শোভিত টেবিলে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে। এতিমখানার বার বছরের বালক বদিউরের মনে এক বিষম ভাবনার জন্ম হয়- 'এ গ্রামে এত গণ্যমান্য এতিম রয়েছেন!'
ক. 'ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী' বাক্যটির জটিল রূপ লেখ।
খ. 'ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ' সংলাপে উকিলের প্রত্যাশিত উত্তর ও কমলাকান্তের অনুধাবনের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
গ. বদিউরের ভাবনার সঙ্গে কমলাকান্তের সংলাপের ভাবার্থের সাদৃশ্য বুঝিয়ে লিখ।
ঘ. উপরের অনুচ্ছেদে 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র মূলভাবটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবেশিত হয়েছে'- মন্তব্যটির ক্ষেত্রে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

হৈমন্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অতুলনীয় ও সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, পত্রসাহিত্য, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী, সংগীত—প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে তাঁর অসামান্য প্রতিভার বিরলদৃষ্ট পরিচয়। এছাড়াও তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্প; সাহিত্য—পত্রিকার সম্পাদক ও দক্ষ শিক্ষা সংগঠক। 'শান্তিনিকেতন' ও বিশ্বভারতী' তাঁরই অবদান। মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। আর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা নিয়ে তিনি এশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' পান। বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ তিনি। তাঁর অসাধারণ ছোটগল্পগুলো প্রধানত সংকলিত হয়েছে 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের চারটি খণ্ডে ও 'গল্পসল্প' গ্রন্থে। 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'বলাকা', মানসী', 'কল্পনা', ইত্যাদি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থসহ তাঁর অজস্র গ্রন্থের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি উপন্যাস, 'রক্ত করবী', 'রাজা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'ডাকঘর', 'চিরকুমার সভা', 'বিসর্জন', ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন; 'বিচিত্র' 'প্রবন্ধ','কালান্তর', 'পঞ্চভূত', 'সভ্যতার সংকট' ইত্যাদি প্রবন্ধঃ 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য' ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, বাংলা ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, বাংলা ২২ শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে।

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেজন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং, বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ. এ. পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ, ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্‌বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রী সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক, স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাব তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্বাদে পুনঃপুনঃ কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্‌বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের মোট পাঁচ–সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেকস্টবুক–কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখ সন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরঙ্গকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যেই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কী? তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার নামটা দিব না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোট ছিল। অথচ, আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী; দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে কিছুতেই তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরেজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরেজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবু বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড় বলিয়াই পনের অঙ্কটাও বড়। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড় কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর–অন্তে এক–এক বছর করিয়া বড় হইতেছে, তাহা আমার শ্বশুরের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজ সংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া দু পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বয়সটা পরীক্ষা পাশ করিবার পক্ষে যত ভাল হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভাল নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয় আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানা রাখিয়া বলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো—একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।"

কোনো এক জন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মলিক কোম্পানির জবড়জঙ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্টি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। যেমন তেমন এখখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা দাগ—কাটা শতরঞ্জ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর, গালিচার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়টির নিচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া ইঠল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্তভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল; দুটো-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায়, শ্বশুরের ছুটি আর মেলে না। ওদিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটা উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্বলগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্তটিকে আমি আমার সমস্তচৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক।

বিবাহসভায় চারিদিকে হট্টগোল; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।' কাহাকে পাইলাম। এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে !

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন, সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়াছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার, ইহার বেশি আশীর্বাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই, মনে কোনো চিন্ড় রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিতেছে, এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন; বলিলেন, "বুড়ি, চলিলাম। তোর একখানি মাত্র বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।"

মেয়ে বলিল, "তাই বই-কি। কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

অবশেষে নিত্য তাঁহার যেসব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক কিরয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; গুটিকয়েক অপথ্য ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি—বাপকে সেই সমস্ড়প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্‌বেগের সহিত বলিল, "বাবা, তুমি আমার কথা রেখো—রাখবে?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মানুষ পণ করে ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। অতএব কথা না দেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ।"

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায় ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক কা-! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গিয়াছে! মায়া মমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারের পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।"

সব শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, "আমার মেয়েটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড় ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক হইতে অর্থসমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনিভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে একেবারে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহ সভাতেই বুঝিলাম, দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো–আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির–না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয়, তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্যের মত ধ্রুব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কী হইবে গোপন রাখিয়া, তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্তআলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র!

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া জানা বড়ো মেয়ে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু অতি অল্পদিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রং ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্তদারীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকেও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানাপ্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কেনো অঙ্কটাই লাখের নিচে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন–যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে লাগিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্তস্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন কি, হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না, তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ এক দিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই– আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তাহার সুদও নিতান্ত্সামান্য নহে। লাখ টাকার গুজব তো একেবারেই ফাঁকি।

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে কোনোদিনই কোনো আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানি না কোন যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশুর রাজার প্রধানমন্ত্রী গোছের একটা-কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাষ্টার-সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা। বাবার বড় আশা ছিল, শ্বশুর আজ বাদে কাল কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময় রাস-উপলক্ষে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।"

আর–এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন?"

আমার মা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কি কথা। বউমার বয়স সবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত্হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।

মা বলিলেন, "আমরা যে কোষ্ঠি দেখিলাম।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠিতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কোষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।?"

এই লয়ইয়া ঘোর তর্ক, এমনকি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময় সেইখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কেনো এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো?"

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। বলিল, "সতেরো।"

মা ব্যস্ত্হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধূর নির্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, "তুমি তো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো।" হৈম চমকিয়া কহিল, "বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।"

মা কহিলেন, "অবাক করিল। বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে 'কখনো না'।" এই বলিয়া আর একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন, কথাটার কালি ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারিদিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এসব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।"

হায় রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে, কী বলিব?"

বাবা বলিলেন, "মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিও আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন।"

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমনভাবে চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন, তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সেদিন দেখিলাম, শরৎপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোখের সেই সরল উদাস দৃষ্টি একটা কী সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, 'আমি ইহাদিগকে চিনি না।'

সেদিন একখানা শৌখিন বাঁধাই করা ইংরেজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তেআস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়াও দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চনা চলিতেছে। এ পর্যন্ড়স সমস্ড়ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে?"

ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল, মাতৃহীন কন্যা প্রবাসে মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এ কী কান্ড! এ কোন নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষে হৈমর বাপের উদ্দেশ্যে যাহা–না বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটু কথার হাওয়া দিয়াছে, হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ড়সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড় বড় দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উটিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা জানেন–সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?" ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উলেখ করিতে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন, খ্রিষ্টানও নন, হয়তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়ায়াছেন-শুনাইয়াছেন, কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বুঝি না, তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোট বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসারযাত্রায় হৈমর সমস্ড়অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ড়আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোট কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ড়আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কেনো নালিশের ইশারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারানীর কাছে শুনিয়াছি, শ্বশুরবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ড়হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই?"

এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম, "তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোস্ট করিয়া দিব।"

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, "এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি. এ, ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী?"

সে তো বটেই। দোষ সমস্ত হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো। তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি, তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্তআকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি. এ, ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাশ করিবই এবং ভালো করিয়াই পাশ করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অবস্থার যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলো পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাশের উদ্‌যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানির বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলো ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সম্মুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে—দেওয়া এক একটা জানালা। দেখি তাহারই একটা জানালায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মলিকদের বাগানে কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিন্তু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গিটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্তনিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহবর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব? আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম যে সমস্তফলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই।

আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর-কাল অন্তঃপুর বাহিরে কত বড় একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কীরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তঃপুর মুহূর্তে মুহূর্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না—তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেই জন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক মনের কথা হয়; এবং এক এক দিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাদে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি! শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অন্তর্ছিল না, কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, হৈমই এইরূপ অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, বউমা, তোমার অসুখটা কিসের?" হৈম বলিল, "অসুখ তো নাই।"

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য।

কিন্তু, হৈম শরীর যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, এ কী! হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অসুখ করে নাই তো?"

হৈম কহিল, "না।"

এই ঘটনার দিন দশেক পরেই বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ আমার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না; জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিলেন না, 'কেমন আছিস।' আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়ি, আমার সঙ্গে যাবি?"

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, "যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, যখন তাঁহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে না সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না। একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—"

বাড়ির-মধ্যের উপর বরাত দেওয়ার অর্থ কী আমার জানা ছিল। বুঝিলাম, কিছু হইবে না। কিছু হইলও না। বউমার শরীর ভালো নাই। এত বড় অপবাদ।

শ্বশুরমশায় স্বয়ং এক জন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "বায়ু পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা।"

আমার শ্বশুর কহিলেন, "জানেন তো উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উহার কথাটা কি—?"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।"

এই কথাটি শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল, তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব।"

বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিও তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রী পরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া

মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা–বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে সে কথা কে জানিত।

পিতায় কন্যায় আর একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুইজনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ফের যদি আসি, তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।"
ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখি নাই। তাহারও পরে কী হইল সেকথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো এক দিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ–থাক্ আর কাজ কী!

শব্দার্থ ও টীকা

মেয়ের বয়স অবৈধ

রকম বাড়িয়া গেছে	–	তৎকালীন হিন্দু সমাজে আট বছর বয়সী কন্যাকে গৌরি, নয় বছর বয়সী কন্যাকে রোহিণী, দশ বছর বয়সী কন্যাকে কুমারী বলা হত। দশ বছর বয়সের মধ্যেই কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। সেই হিসেবে মেয়েটির বিয়ের বয়স সাত বছর আগেই পার হয়ে গিয়েছিল।
আপেক্ষিক গুরুত্ব	–	তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতা।
এফ.এ.	–	সে সময়ে বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়কে এফ. এ. বা First Arts বলা হত।
প্রজাপতি	–	ব্রহ্মা। হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিয়ের দেবতা।
পৌনঃপুনিক	–	বারবার ঘটে এমন। এখানে বার বার উত্থাপিত।
কলপ	–	পাকা, সাদা চুল কালো করার রং।
বিষম	–	দারুণ, দুঃসহ।
দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগিল	–	মনের মধ্যে বসন্ত–বাতাসের হিলোল বইতে থাকল। আনন্দে বিয়ের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল।
বার্ক	–	এডমন্ড বার্ক (১৭২৯ –১৭৯৭) ইংরেজি রাজনীতিক, প্রাবন্ধিক বিপ্লবের উপরে লেখা এডমন্ড বার্কের গ্রন্থ–'Reflections on the Revolution if France।' খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন	–	আঠারো শতকের শেষ প্রান্তে সংঘটিত ঐতিহাসিস ফরাসির বিপ্লবের উপরে লেখা এডমন্ড বার্কের গ্রন্থ। Reflections on the Revolution in France' এটি ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রাকশিত হয়।
টেকস্ট বুক কমিটি	–	পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করে এমন সংস্থা।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	–	বোপদেব গোস্বামী রচিত সংস্কৃত ভাষায় বিখ্যাত ব্যাকরণ–'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্।'
শ্মশানচারী	–	শ্মশানে বিচরণ করে এমন।
জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো		
জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন	–	জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রোদকে লেখক অশ্রুবিহীন কান্না হিসেবে কল্পনা করেছেন। এ উপমার ভেতর দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে প্রচণ্ড দুঃখের দহনে অপুর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। তার এই কাহিনী বর্ণনা তাই অশ্রুহীন রোদনের নামান্তর।
প্রত্নতাত্ত্বিক	–	প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রালিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যা বা প্রত্নতত্ত্বে পন্ডিত ব্যক্তি archaeologistc পুরাতত্ত্ববিদ।
তাম্রশাসন	–	তামার পাতে খোদাই করা প্রাচীন কালের রাজাজ্ঞা বা অনুশাসন।
গৌরীদান	–	মেয়েদের বয়স সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রবিদদের বিধান অনুসারে আট বছর বয়সী কন্যাকে বিয়ে দেওয়া।
কষিয়া	–	পূর্ণোদ্যমে। খুব করে।
খিড়কি	–	বাড়ির পেছনের দিক বা পেছনের দিকের দরজা।
সমাজ-সংস্কারক	–	যাঁরা সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা হিসেবে থাকা নানা-দোষ ত্রুটি, পশ্চাদ্‌পদতা, প্রথা ইত্যাদি দূর করে সমাজের উন্নতি সাধন করেন।
আনাড়ি	–	অনিপুণ।
জবড়জঙ	–	পারিপাট্যহীন। বেমানান। বেঢপ।
টিপাই	–	তিন পায়াওয়ালা ছোট টেবিল। ইংরেজি `Tripod' শব্দজাত।
গালিচা	–	পুরু ফরাশ। কার্পেট।
পদ্মাসন	–	দুই পা মুড়ে বসার বিশেষ ভঙ্গি। পদ্মের আসন।
অকাল	–	বিয়ে ইত্যাদি শুভকাজের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত সময়।
হিমালয়ের তিনি যেন মিতা	–	হিমালয়ের একটি শৃঙ্গের নাম গৌরিশংকর। অপুর শ্বশুরের নামও গৌরীশংকর। তিনি থাকতেন হিমালয়ে। তাঁর চরিত্রেও ছিল হিমালয়ের বৈশিষ্ট্য। এসব বিবেচনায় অপু তার শ্বশুরকে হিমালয়ের মিতা বলেছে।
প্রস্রবণ	–	ঝরনা।
অন্তঃপুরিকা	–	অন্দর মহলের মহিলা।
খোট্টা	–	নিন্দার্থে হিন্দিভাষী লোকজন।
নিভৃত	–	নির্জন জায়গা।
গলাধঃকরণ	–	গিলে ফেলা।
পাকযন্ত্র	–	পাকস্থলী ইত্যাদি হজমের অঙ্গ।
আভ্যন্তরিক উদ্বেগ	–	ভেতরের অস্বস্তি

সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ	–	এখানে সম্পত্তি বলতে জমিজমা, বিষয়-আশয় ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে যা অর্থমূল্যে বিক্রি করা চলে। পক্ষান্তরে সম্পদ বলতে গৌরব ও ঐশ্বর্য বাড়ায় এমন অমূল্য কিছুকে বোঝানো হয়েছে। অপুর কাছে হৈমন্তীই ভোগ্যবস্তু ছিল না, ছিল যথার্থ জীবনসঙ্গিনী ও গৌরবের ধন।
ধ্রুব	–	অক্ষয়, নিত্য।
ক্ষণজীবিনী	–	স্বল্পস্থায়ী।
রীতিপদ্ধতি	–	কায়দাকানুন।
জনশ্রুতি	–	লোকমুখে শোনা যায় এমন জনরব।
প্রবঞ্চনা	–	প্রতারণা, ঠকানো।
ওঁচা	–	হেয়, জঘন্য, নিকৃষ্ট।
রাস	–	শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সংক্রান্তউৎসব।
কোষ্ঠি	–	জন্মপত্রিকা, জীবনের শুভাশুভ নিরূপিত থাকে এমন পত্র।
মূঢ়তা	–	অনভিজ্ঞতা, বোকামি।
একগুঁয়েমি	–	একরোখা ভাব।
আইবড়	–	অবিবাহিত, এখানে নিন্দাসূচক ব্যবহার ঘটেছে।
পঞ্চম স্বর	–	কোকিলের সুরলহরী, রাগবিশেষ।
বাজখাঁই নাদ	–	কর্কশ ধ্বনি, বাজ খাঁ বা বাজ বাহাদুর খাঁ নামে একজন গায়কের মাধুর্যহীন কর্কশ কণ্ঠস্বর বা সুরের অনুরূপ ধ্বনি।
দুর্গতি	–	দুর্ভোগ, দুর্দশা, দুরবস্থা।
সংশয়	–	দ্বিধাবোধ, অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা।
সৌখিন	–	মনোরম, বিলাসী।
আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়	–	'আকাশ ভেঙে পড়া'-কথাটি বিশিষ্ট প্রয়োগ। অর্থ-আকস্মিক বিপদে দিশেহারা হওয়া।
নাস্তিক	–	ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় এমন।
প্রবাস	–	বিদেশে বসবাস।
লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই	–	দুরবস্থা নেমে আসতে দেরি হবে না।
কটুকথা	–	তিরস্কার, গালিগালাজ।
ঋষি	–	শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী।
দেবার্চনা	–	দেবতার আরাধনা, পূজা।
গঞ্জনা	–	যাতনা, ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা।
ক্ষুব্ধ	–	মনঃক্ষুণ্ন, ক্ষোভে আলোড়িত।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে	–	ছিদ্রে ছিদ্রে।
অকাতর চিত্তে	–	অক্লেশে, নির্দ্বিধায়।

চুলায় দিতে পারিতাম	–	পরিত্যাগ করতে বা বিসর্জন দিতে পারতাম।
আসক্তি	–	তীব্র লিপ্সা, গভীর অনুরাগ।
মার্টিনো	–	ইংরেজ লেখক।
গরাদে দেওয়া	–	লোহা বা কাটের মোটা শিক লাগানো।
অনবধানতা	–	মনোযোগের অভাব, অমনোযোগিতা।
হু হু করিয়া উঠিল	–	গভীর দুঃখে ভরে গেল।
শূন্যতা	–	রিক্ততা, ফাঁকা ভাব।
নৈরাশ্যের গহ্বর	–	নিরাশার গভীর গর্ত।
কণ্টকশয়ন	–	কাঁটার বিছানা।
গিরিনন্দিনী	–	পর্বতদুহিতা, হৈমন্ড়ি হিমালয়ের উদার মুক্ত পরিবেশে বড় হয়েছে বলে তাকে এই বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে।
মার্টিনো পড়িয়া রহিল	–	লেখক মার্টিনোর লেখা 'চরিত্রতত্ত্ব' বই পড়ে রইল।
স্পর্ধা	–	দুঃসাহস, ঔদ্ধত্য।
আবির্ভাব	–	হঠাৎ আগমন।
উপদ্রব	–	অহেতুক উৎপাত।
বাড়ির মধ্যের	–	অন্দর মহলের।
বরাত দেওয়া	–	অন্যের ওপর দায়-দায়িত্ব অর্পণ, এখানে অজুহাত দেওয়া।
শক্ত ব্যামো	–	কঠিন অসুখ, দুরারোগ্য ব্যাধি।
দক্ষিণার জোরে	–	টাকা পয়সা দিয়ে।
কাঠ হইয়া গেল	–	কাঠের মতো অনড় ও স্পন্দনহীন হয়ে গেল।
চাপা দেওয়া	–	গোপন করা।
কানাকানি	–	গোপন পরামর্শ।
কষিয়া	–	মনোযোগ দিয়ে, উদ্যমের সঙ্গে, ভালোমতো।
চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো	–	প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া বা সন্দেহ দূর করা।
মন পাওয়া	–	সম্মতি বা প্রীতি লাভ করা।
কানাকানি পড়িয়া যাওয়া	–	গোপনে নিন্দা রটানো।
বাড়ন্ড়	–	বেড়ে উঠেছে এমন।
গা টেপাটেপি করা	–	অন্যকে লুকিয়ে গায়ে হাত দিয়ে কোনো কিছুর প্রতি ইশারা বা ইঙ্গিত করা।
ঢাক পেটানো	–	সগর্বে প্রচার করা।
বাজখাঁই	–	কর্কশ ও উঁচু।

মাথা হেঁট হওয়া	–	অপমানিত বা লজ্জিত হওয়া।
আকাশ ভাঙিয়া পড়া	–	আকস্মিক বিপদে দিশেহারা হয়ে যাওয়া।
মাথা খাওয়া	–	বিগড়ে দেওয়া, সর্বনাশ করা।
শিকায় তোলা	–	স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা।
চুলায় দেওয়া	–	গোলায় যেতে দেওয়া।
কানায় কানায় ভরিয়া ওঠা	–	পুরোপুরি ভরা।
লজ্জার মাথা খাওয়া	–	নির্লজ্জের মতো আচরণ করা।
বুক ফাটিয়া যাওয়া	–	শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া।

উৎস ও পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পটি প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রিঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি প্রথমে 'গল্প সপ্তক' গ্রন্থে (১৯১৬ খ্রিঃ) সংকলিত হয়েছিল। পরে 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৬ খ্রিঃ) সন্নিবেশিত হয়।

'হৈমন্তী' এক স্বভাবকোমল পবিত্র মাধুর্যময় লাবণ্যময়ী মেয়ের কাহিনী, যে যৌতুক প্রথার যূপকাষ্ঠে হয়েছে নির্মম বলি। হৃদয়হীন স্বার্থান্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির নিষ্ঠুর আচরণে আর তার গুণমুগ্ধ পৌরুষহীন স্বামীর নিশ্চেষ্ট অসহায়তার মুখে সরল শুভ্র নিষ্কলঙ্ক সত্যব্রতী এবং একই সঙ্গে তেজস্বিনী হৈমন্তীর বেদনাবিধুর পরিণতি আমাদের মর্মমূলে আঘাত করে। নিতান্তসাধারণ এক পারিবারিক পরিমণ্ডলের অসাধারণ ছবি আঁকার দক্ষতা এবং চরিত্র চিত্রণে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, গভীর সহানুভূতি ও অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের পরিচয় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যময় ছোটগল্পে।

অনুশীলনমূলক কাজ

সাহিত্যবোধ ❐ ছোটগল্প

আমরা গল্প শুনে বা পড়ে আনন্দ পাই। যেকোনো গল্পেই আমরা আকৃষ্ট হই ঘটনার ঘনঘটায়। এ থেকে আমরা পাই (১) প্লট বা কাহিনী। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নানা কাহিনীর সূত্রে নানা মানব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এরা হল গল্পের (২) চরিত্র। গল্পের কাহিনীর ভেতর দিয়ে আমরা মানব-ভাগ্য সম্পর্কে হয়তো অনেক ধারণা পেয়ে যাই এবং তাতে করে গল্পের (৩) মর্মবাণী আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। এভাবে কাহিনী, চরিত্র এবং মর্মবাণীর ভেতর দিয়ে

আমরা পরিচিত হই গল্পকার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে (৪) দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদি সান্নিবেশ গল্পটি আমাদের কেমন লেগেছে?

এরপর আমরা দৃষ্টিপাত করব এর গঠন ও নির্মাণশৈলীর দিকে। তা যথাযথভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে আমরা কিছু প্রশ্নের সাহায্য নিতে পারি: কী ঘটেছে? কার ক্ষেত্রে ঘটেছে? কেন? কীভাবে? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা পেয়ে যাই গল্পের (১) কাহিনী বা ঘটনাধারার নির্মাণ কাঠামো। কার ক্ষেত্রে ঘটেছে? এই প্রশ্নের জবাবে ফুটে

ওঠে গল্পের বিভিন্ন (২) চরিত্র কেন? এই প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানের চেষ্টায় আমরা পেয়ে যাই গল্পের (৩) বিষয়বস্তু বা মর্মবাণী যা কিনা চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও মূর্ত করে। আর এসব প্রশ্নের জবাবে কীভাবে লেখক জীবনের তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পে, সেটাই হচ্ছে লেখকের (৪) দৃষ্টিভঙ্গি।

সাহিত্যবোধ ❑ আত্মজিজ্ঞাসা

সাহিত্য উপলব্ধি করার এক ধরনের উপায় হচ্ছে নিজে নিজে প্রশ্ন করে উত্তর খোঁজা। তবে এক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে সাহিত্যকর্ম পরীক্ষা করা যায় তা জানা দরকার। গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি সাহিত্যকর্ম বুঝতে হলে প্রধানত প্রশ্ন করতে হয় চরিত্র, তাদের অবস্থা, তাদের উদ্দেশ্য, দ্বন্দ্বের কারণ, তাদের প্রত্যাশা, অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্পর্কে। যে পরিবেশে তারা অবস্থান করে সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করতে হবে। তাছাড়া তাদের ক্রিয়াকলাপ ও সংঘটিত ঘটনায় তাদের ভূমিকা ও গুরুত্ব এবং সে সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবও খুঁজে দেখতে হয়।

'হৈমন্তী' সম্পর্কিত নিচের প্রশ্নগুলোর যে সব জবাব তোমার মনে আসে লিখে ফেল। তাহলে গল্পটি যে শুধু ভালোভাবে বুঝবে তা নয়, তোমার গোছানো উত্তর তৈরি করার জন্যেও তা কাজে লাগবে।

১. (ক) হৈমন্তীর নিজের বাড়ির পরিবেশ কেমন ছিল? (খ) বিয়ের পর নতুন জায়গায় পরিবেশে সে কী ধরনের ব্যবহার পেয়েছে? (গ) সেই পরিবেশের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটল কেন? (ঘ) এতে সে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন?

২. হৈমন্তীর বয়স কত ছিল? এই গল্পে তার বয়স কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেছে কী?

৩. অপুর চোখে হৈমন্তী কোমল ও মৃদুভাষী। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে?

৪. হৈমন্তীর বাবা কেমন লোক ছিলেন? মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে যে ছবি এই গল্পে রয়েছে তা এঁকে এঁকে উল্লেখ কর।

৫. (ক) হৈমন্তীর বাবার সঙ্গে অপুর বাবার চরিত্রের কী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?
(খ) অপুর বাবা হৈমন্তীর বাবাকে প্রথমে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন?
(গ) হৈমন্তীকে বাড়িতে নিতে এসে তিনি প্রত্যাখ্যাত হলেন কেন?

৬. শ্বশুর বাড়ির নির্মম আচরণে হৈমন্তীর ভেতরে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল? সে সবচেয়ে দারুণ আঘাত পেয়েছে কিসে? এক্ষেত্রে গল্পে 'ঋষিবাবা' কথাটি ব্যবহারের তাৎপর্য কী?

৭. (ক) অপু কোন ধরনের লোক? (খ) হৈমন্তীকে কতটা ভালোবাসত?
(গ) সে-ই বা হৈমন্তীকে কতটা ভালোবাসত?

৮. হৈমর প্রতি পিতামাতার রূঢ় নির্মম আচরণের মুখে অপুর অসহায়তার কারণ কী? এই অসহায়তা কতটুকু সঙ্গত?

৯. অপু 'দ্বিতীয় সীতা–বিসর্জনের কাহিনী' কথাটি দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে?

১০. (ক) হৈমন্তীর শেষ পরিণতি কী হয়েছিল?
(খ) ঐ পরিণতির জন্য কে বা কারা দায়ী?

চরিত্র চিত্রণ ও বিশ্লেষণ

কোনো চরিত্র চিত্রণ বা বিশ্লেষণ সাধারণভাবে নিচের ছক অনুসারে হতে পারে:

১. **সূচনা:** যে চরিত্র আলোচনা বা বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছে তার উল্লেখ করে তার চরিত্রের আসল বা মৌলিক কথাটি লেখ।

২. **মধ্যভাগ:** চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিকের ওপরে আলোকপাত করোনে রাখবে চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে প্রথমত, চরিত্র যা বলে, ভাবে ও করে তার মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত, ঐ চরিত্র সম্পর্কে অন্যান্য চরিত্র যা বলে ও ভাবে তার মাধ্যমে; তৃতীয়ত, গল্পের কথক ঐ চরিত্রকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলেন তার মাধ্যমে।

৩. **সমাপ্তি :** তোমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্তসার লেখ এবং গল্পের বিষয়বস্তু বা মর্মবাণী ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে চরিত্রের ভূমিকার গুরুত্বকে জোরালোভাবে দেখাতে চেষ্টা কর।

এই খসড়া ছক-এর আদলে হৈমন্তীচরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য সূত্রায়ত করা যেতে পারে এভাবে:

১। **সূচনা:** কোমল, উদার, সরল, শুভ্র, হৈমন্তীকে স্বার্থক্লিষ্ট সংসারের নির্মম নিষ্ঠুরতার বিষবাষ্পে তিলে তিলে করুণ পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছে।

২। **মধ্যভাগ :** ক) স্বামী অপুর স্বীকৃতিতে হৈমন্তীর কোমল মাধুর্য ও চরিত্র সুষমা। খ) স্বার্থক্লিষ্ট সংসারের নিষ্ঠুরতার মুখে হৈমন্তীর বাগ্যবিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির চিত্র এরকম:

(এক) অপুত্রকে বেহাই-এর আজীবন সঞ্চিত লক্ষাধিক টাকা ঘরে আসবে এবং পুত্র শ্বশুরের সাহায্যে বড় চাকরি পাবে অপুর পিতার এই আশা ভঙ্গ হলে হৈমন্তীর ওপর নিষ্ঠুরতার শুরু

(দুই) রূঢ় নির্মম নিষ্ঠুরতায় হৈমন্তীর দেহমন শুকিয়েছে কিন্তু কোনো প্রতিবাদ বিক্ষোভ সে করে নি।

(তিন) দারুণতম আঘাত এসেছে পিতার প্রতি শ্বশুর বাড়ির লোকের অসম্ভ্রম ও অবজ্ঞায়।

(চার) পিত্র-নির্ভরতার বন্ধন শিথিল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে সমস্তজীবন হয়েছে বিস্বাদ ও অর্থহীন।

(পাঁচ) মর্মান্তিক আঘাত এসেছে স্বামীর নিশ্চেষ্টতা ও অক্ষমতায়।

৩। **সমাপ্তি:** হৈমন্তীর বেদনাবিধুর নির্মম পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনে যৌতুক প্রথার নির্মম বেদনাদায়ক দিকটিই আমাদের মর্মমূল স্পর্শ করে।

সমালোচনামূলক আলোকসম্পাত

চরিত্র চিত্রণের মত মূল্যায়নধর্ম লেখার সময়ে কেবল কাহিনী সম্পাত না করাই ভালো। বরং কাহিনীসূত্র যথাসম্ভব মূল্যায়নমূলক মন্তব্য—সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। কথাটা স্পষ্ট হবে কাহিনী স্পাতের সঙ্গে নিচের সমালোচনামূলক মন্তব্যের তুলনা লক্ষ্য করলে :

কাহিনী সম্পাত : 'হৈমন্তী' গল্পের নায়িকা হৈমন্তী

সমালোচনামূলক মন্তব্য : 'হৈমন্তী' গল্পটির উপজীব্য বিষয় 'যৌতুকের' বলি হিসেবে নায়িকা হৈমন্তীর বিষাদঘন করুণ পরিণতি।

কাহিনী সম্পাত : হৈমর প্রতি অপুর ভালবাসার ঘাটতি ছিল না।

মূল্যায়নধর্মী : হৈমর প্রতি অপুর ভালোবাসার ঘাটতি না থাকলেও অপুর ক্লীবত্ব ও অক্ষমতা অনিবার্যভাবে হৈমন্তীর মর্মান্তিক পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এভাবে যতটা সম্ভব তোমার লেখা মূল্যায়নধর্মী হলে ভালো। এই আলোকে এবার হৈমন্তীর চরিত্রের ভূমিকা অংশ লিখতে চেষ্টা করে। তুমি হয়তো এভাবে শুরু করতে পার :

হৈমন্তীরবীন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ ছোটগল্প।

এর চেয়ে সম্ভবত এটা ভালো, যদি তুমি লেখ:

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছোটগল্প 'হৈমন্তীর প্রতিপাদ্য বিষয় পণপ্রথার মারাত্মক কুফল।
আরও ভালো করার জন্য শুরুটা এভাবেও করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছোটগল্প 'হৈমন্তী'তে পণপ্রথার মারাত্মক কুফল ফুঠে উঠেছে স্বার্থান্ধ সংসারের নির্মম নিষ্ঠুরতায় গল্পের নায়িকা হৈমন্তীর করুণ পরিণতিতে।
কিংবা তা এরকমও হতে পারে :
রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছোটগল্প 'হৈমন্তী'তে পণপ্রথার মারাত্মক কুফলের দিকটা ফুটে উঠেছে হৈমন্তীচরিত্রের বেদনাঘন পরিণতির মাধ্যমে, যেখানে স্বার্থান্ধ সংসারের নির্মম নিষ্ঠুরতার যাঁতাকলে হৈমন্তীর স্বল্পায়ু বধূ-জীবনের পরিণতি অশ্রুবিন্দুর মতো জমাট বেঁধেছে।
নিজের লেখা নিজেই এভাবে আরও উন্নত করতে পারো তোমরা। তবে এর জন্য চেষ্টা করতে হয়। সময় দিতে হয়।

ভাষা অনুশীলন ❑ নির্দেশক বাক্য

নির্দেশক বাক্যে কোনো তথ্য, সংবাদ বা ঘটনার বর্ণনা বা বিবৃতি নির্দেশিত হয়। এ ধরনের বাক্য দুটো ভাগে বিভক্ত।

ক) **সদর্থক বা অস্তিবাচক :** এতে কোনো নির্দেশ, ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার সংবাদ থাকে। যেমন:
বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা জিতেছে।
আজ দোকানপাট বন্ধ থাকবে।

খ) **নেতিবাচক বা নঞর্থক :** এ ধরনের বাক্যে কোনো কিছু হয় না বা ঘটছে না–নিষেধ, আকাঙ্খা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি সংবাদ কিংবা ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন:
আজ ট্রেন চলবে না।
আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

❑ **বাক্যের রূপান্তর**

বাক্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত রাখতে হয়। প্রয়োজনে শব্দের কিছুটা পরিবর্তন, নতুন শব্দ যোগ কিংবা শব্দ অর্জন করা যেতে পারে।

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক

অস্তি : বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল:

নেতি : বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যই ছিল না।

অস্তি : পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল।

নেতি : পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ রহিল না।

অস্তি : শ্বশুরের ও তাহার মনিবের উপর রাগ হইল।

নেতি : শ্বশুরের ও তার মনিবের উপর রাগ না হইয়া পারিলাম না।

নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক

নেতি : দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁহার আস্থা ছিল না।

অস্তি : দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁহার অনাস্থা ছিল।

নেতি : আমার প্রণাম লাইবার জন্য সবুর করিলেন না।

অস্তি : আমার প্রণাম লইবার পূর্বেই প্রস্থান করিলেন।

নেতি : কিন্তু রবফ গলিল না।

অস্তি : কিন্তু বরফ অগলিত রহিল।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'হৈমন্তী' গল্পে অপুর জীবনে কত বছর বয়সটি অক্ষয় হয়েছিল?

ক. ষোল খ. সতের

গ. আঠার ঘ. উনিশ

২. হৈমন্তী যোল বছর বয়সটি ছিল-

i. সময়ের ষোল

ii. প্রকৃতির ষোল

iii. নিয়মের ষোল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের সংলাপগুলো পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আলো : বাবা, আমার ফিরতে সন্ধ্যা হবে। খাবার হটপটে রেখে গেলাম, সময়মত খেয়ে নিও।

আফতাব : ঠিক আছে। চিনির কৌটোটা কোথায় রে মা?

আলো : ওটা আমি সরিয়ে রেখেছি। চিনি পেলে তুমি সারাদিন তিন কাপ চায়ে ছ-চামচ চিনি খাবে।

আফতাব : দেখিস তোর লুকনো চিনির কৌটার মতো না আমিও জীবন থেকে লুকায়িত হই! হা হা হা!

৩. গৌরীশংকর ও হৈমন্তীর কথোপকথনের সঙ্গে সংলাপগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে-

i. ভাবে

ii. সাহিত্য ধরণে

iii. ভাষা শৈলীতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. ' হৈমন্তী ' গল্পের পিতা-পুত্রীর কোন বিষয়টি সংলাপগুলোর মূলভাবের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. সম্পর্কের গভীরতা　　খ. উদার মনোভাব

গ. চিন্তার স্বাধীনতা　　ঘ. বাকপটুতা

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রমেন বাবু একমাত্র কন্যা দীপার বিয়েতে শ্বশুর বাড়ির চাহিদা মেটাতে দশভরি স্বর্ণালংকার ও লক্ষ টাকা দিয়েছেন। দীপা শিক্ষকতা করেন; কবিতা পাঠ ও তার আলোচনায় তাঁর অবসর কাটে। সংসারের কাজেও সে পারদর্শী। সৎপাত্রে কন্যাদান হয়েছে ভেবে রমেন বাবু মৃত্যুর আগে তাঁর বিষয় সম্পত্তি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দান করেন।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

খ. 'আইবড়' মেয়ে বলতে হৈমন্তী গল্পে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. হৈমন্তী চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য দীপার মধ্যে লক্ষ করা যায়? বুঝিয়ে দাও।

ঘ. গৌরীশঙ্কর বাবু ও রমেন বাবুর চরিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

২। ঘটনা-১

'গায়েগতরে একটু বাড়লেই হগ্গলের চক্ষু টাটায়, স্কুলে যাইতে পারে না। খেলতে পারে না। মাতব্বর কয়-কি, মাইয়ারে বিয়া দিবা না? ঘরে রাখন দায় তখন। মাইয়ারা যত বড় হইব টাকা তত বেশি লাগব। এত টাকা কই পামু কন'- সাফুল্যচরগ্রামের হাজির বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন পঞ্চাশোর্ধ দুলু মিয়া।

ঘটনা-২

হাটাইলের আড়ালিয়া গ্রামের পারভীনের বিয়ে হয় হাফিজের সঙ্গে। এক বছর আগে বিয়ের কথা পাকাপাকির সময়ে নির্ধারিত টাকা হাতে পাওয়ার দুই তিন দিন পর কাজের কথা বলে ঘর ছাড়ে হাফিজ। পারভীনকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে তার কথা ও আচরণে অসংগতি দেখা দিয়েছে।

ক. হৈমন্তী প্রকৃত ভক্ত কে ছিল?

খ. 'পাশ করিবই এবং ভালো করিয়াই পাশ করিব'- অপুর এই পণ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ ' হৈমন্তী ' গল্পে ফুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের ঘটনা দুটি পরিবর্তিত সময়ের পটে ' হৈমন্তী ' ছোট গল্পে ফুটে ওঠা সমাজ চিত্রের প্রকাশভেদ মাত্র – এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

সাহিত্যে খেলা

প্রমথ চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন পরিশীলিত বাগবৈদগ্ধময় রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে 'বীরবল' ছদ্মনামে। বাংলা সাহিত্যে ভাষারীতির প্রথম মুখপত্র 'সবুজপত্র' (প্রথম প্রকাশ: ১৯১৪) পত্রিকাটি ছিল তাঁরই সম্পাদিত এবং রবীন্দ্রনাথসহ সমকালীন বিখ্যাত মননশীল লেখকদের অনেকেই ছিলেন এই পত্রিকার লেখক। তার গদ্যশৈলীর নিদর্শন রয়েছে 'চার ইয়ারী কথা' 'বীরবলের হালখাতা' 'রায়তের কথা', 'তেল -নুন-লকড়ি' ইত্যাদি গ্রন্থে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো ও 'সনেট পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে গল্পকার ও সনেটকার হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বিশিষ্ট আসন দিয়েছে।
প্রমথ চৌধুরীর পৈত্রিক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে।

জগৎ-বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর রোদ্যোঁ, যিনি নিতান্তজড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেবদানব কেটে বার করেছেন তিনিও শুনতে পাই, যখন তখন হাতে কাদা নিয়ে, আঙুলের টিপে মাটির পুতুল ত'য়ের করে থাকেন। এই পুতুল গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রেদ্যোঁ কেন, পৃথিবীর শিল্পী মাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড়বড় শিল্পীদের তফাত এইটুকু যে তাঁদের হাতে এক করতে করতে আর হয় না। সম্ভবত এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুশি তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্তবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে তখন সেই সব দিকেই গতায়াত করবার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন স্বভাবতই যেখানে আছে তারই চারপাশে ঘুরে বেড়াতে চায়, উড়তেও চায় না ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে সাধারণ লোককে কি ধর্ম, কি নীতি, কি কাব্য, সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন মন আকর্ষণ করতে পারি নে। বেদীতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না, রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না, আর কাষ্ঠমঞ্চে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাকবার লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টা টঙে চড়ে থাকতে চাই, কিন্তু পারি নে। অনেকের পক্ষে নিজেদের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়। এসব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হলেও আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্তব্য। কিন্তু ডাইনে-বাঁয়ে ছোটখাট গলিখুঁজিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ করবার যে অধিকার তাদের আছে, সে অধিকার আমরা কেন বঞ্চিত হব। গান করতে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে, কবিতা লিখতে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করেবার প্রবৃত্তি ন্যায় অধিকারও বড়-ছোট সকলের সমান আছে। এমনকি, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদ নেই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা করবার জন্য সাহিত্যজগতে প্রবেশ করি, তাহলে নির্বিবাদে সে জগতের রাজ-রাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্নশ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।

লেখকেরাও অবশ্য দশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ন হন। কেননা তাঁরাইু হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকি সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্য নূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবিমনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। এমনকি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতিকবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তি স্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচ্চঃস্বরে উচ্চবাক্য না করলে জনসাধারণের নয়ন-মন আকর্ষণ করা যায় না এমন কোনো কথা নেই। সাহিত্যজগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহজ আছে, ক্ষমতা আছে, মানুষের নয়ন–মন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষ যে খেলা দেখতে ভালোবাসে তার পরিচয় তো আমরা এই বড় সমাজেও নিত্য পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক জন যায় আর গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতেই বা ক জন যায়। অথচ এ কথায় সত্য যে, টাউনহলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্যহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ, কেননা তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর কোনো ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থগত নয়, সে কারণে তা কারও নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরই অধিকার সমান।

সুতরাং সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়, স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কেনোরূপ কার্য–উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না। কেননা খেলা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনোই অভাব নেই তবু তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্ব সৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই–সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত; কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন।

সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক–এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনতুষ্টি হতে পারে, কিন্তু আ গড়ে লেখকের মনতুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠক সমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে। সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জার্মানিরই হোক দুদিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠক সমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই; কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা।

অপর পক্ষে এ যুগ পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ, সুতরাং তাদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্ড়খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং সস্ড়করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অবএব সাহিত্যে আর যাই কর-না কেন পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরো না।

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য রচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমত শিক্ষা জচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ড়অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে; কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো; কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, একথা সকলেই জানেন। তৃতীয়ত অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্ড়শিক্ষা জন্মলাভ করছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা, শিক্ষাদান করা নয়—একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

বাল্মীকি আদিতে মুনি—ঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, জনগণের জন্য নয়। একথা বলা বাহুল্য যে, বড় বড় মুনি-ঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমনকি কৌপীন পর্যন্ড় পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসেবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে-পঠনে আনন্দ উপভোগ করে তার একমাত্র কারণ, আনন্দের ধর্মই এই যে তা সংক্রামক। অপর পক্ষে লাখে একজনও যে যোগবশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না তার কারণ, সে বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্য নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাস্টারির ভার নেয় নি। এতে দুঃখ করবার কেনো কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাস্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাস্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস, কিন্তু স্কুলমাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দন্ড়ায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে থাক, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপ দেখতে পাই নি, শুধু তার গুণ শুনি। টীকা—ভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্য সম্বন্ধে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জানি, কিন্তু সে যে কী বস্তু তা চিনিনে।

আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, পাথুরে কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্রঃ অপর পক্ষে হীরক ও কাচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে; এবং এ উভয়ের ভিতর এ দা—কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনো সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা সাহিত্যে কাচকে হীরা এবং হীরাকে কাচ বলে নিত্য ভুল করি, এবং হীরা ও কয়লাকে একশ্রেণীভুক্ত করতে তিলমাত্র দ্বিধা করিনে, কেননা ওরূপ করা যে সংগত তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তারপরে তার শবচ্ছেদ করা, এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এই সব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়। কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।

বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কী, তা জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ, তর্কসাপেক্ষ নয়। সাহিত্যের মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে। এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে কোনো সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পর্শষ্টতর করা আমার অসাধ্য।

এই সব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধু এই সিদ্ধান্তেউপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়।

শব্দার্থ ও টীকা

রোদ্যাঁ	–	ফ্র্যাঁসোয়া অগুস্ড়রোদ্যাঁ (১৮৪০-১৯১৭) বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে বিশেষভাবে উলেস্নখযোগ্য হচ্ছে–'নরকের দুয়ার' ও 'বাঘার্স অব ক্যালে। অন্যান্য অবিনশ্বর কীর্তি–'চিন্তাবিদ', 'আদম' 'ইভ',। তিনি ভিক্টর হুগো, বালজাক, বার্নার্ড শ প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন।
শিব	–	মহাদেব, মঙ্গলকারী দেবতা।
ইতর	–	নীচ, অধম। এখানে নগণ্য অর্থে ব্যবহৃত।
কলারাজ্য	–	শিল্পকলার পরিমণ্ডল।
অবতীর্ণ	–	অবতার হিসেবে মানুষের মূর্তিতে নেমেছে এমন বা নেমে আসা।
মর্তবাসী	–	মাটির পৃথিবীর অধিবাসী।
রসাতল	–	পুরাণে বর্ণিত ষষ্ঠ পাতাল, অধঃপাত ধ্বংস।
গতায়াত	–	যাতায়াত।
প্রবৃত্তি	–	অভিরুচি, ইচ্ছা, ঝোঁক, আসক্তি।
অগত্যা	–	অন্য উপায় না থাকায়, নিরুপায় বা বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।
সুর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে	–	সুর উচ্চ সপ্তকে ধরে রাখতে হবে।
গীতিকবিতা	–	আত্মভাবপ্রধান কবিতা বিশেষ, লিরিক, Lyric।
রঙ্গভূমি	–	আমোদ-প্রমোদের জায়গা। অভিনয় প্রদর্শনের স্থান।
স্বগতোক্তি	–	আপন মনে নিজে নিজে কথা বলা, অন্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি এমন উক্তি।
স্বার্থ	–	নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি।
পরার্থ	–	অন্যের হিত, পরোপকার।
নিষ্কাম কর্ম	–	ফললাভের কামনা করা হয়নি এমন কাজ।
মোক্ষলাভ	–	ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভ, আত্মার মুক্তি অর্জন।
জীবাত্মা	–	প্রাণীর দেহে অবস্থানকারী আত্মা।
পরমাত্মা	–	পরম ব্রহ্ম, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা।
মনোরঞ্জন	–	মনের সন্তোষ সাধন।
স্বধর্মচ্যুত	–	নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত।

http://zoaddar.org

খেলো করা	–	গুরুত্বহীন বা অসার করা।
বৈশ্য	–	প্রাচীন আর্যসমাজের চতুর্বর্ণের তৃতীয় স্তর–যারা কৃষিকাজ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করত।
শূদ্র	–	প্রাচীন আর্যসমাজে চতুর্বর্ণের নিম্নতম শ্রেণী বা বর্ণ, অনার্য।
মতিগতি	–	ইচ্ছা ও প্রবণতা।
বাল্মীকি	–	'রামায়ণ' প্রণেতা বিখ্যাত ঋষি ও কবি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আদি কবি হিসেবে সম্মানিত। যৌবনে এঁর নাম ছিল রত্নাকর এবং পেশা ছিল দস্যুতা। জনশ্রুতি অনুসারে তিনি ব্রহ্মার উপদেশে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে তপস্যামগ্ন হন এবং নারদের উপদেশে রামায়ণ রচনা করেন।
কুশীলব	–	নট, অভিনেতা।
যথাসর্বস্ব	–	সমস্তকিছু।
কৌপীন	–	ল্যাঙট।
পেলা	–	পাঁচালী কীর্তন ইত্যাদির আসরে গায়ক–গায়িকাকে দেওয়া শ্রোতাদের পারিতোষিক।
যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ	–	রামচন্দ্রের প্রতি বলিষ্ঠ মুনির উপদেশ সংবলিত সংস্কৃত রামায়ণ। এতে যোগ ও আত্মজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উপাখ্যানসহ উপদেশাকারে আলোচিত হয়েছে।
কস্মিনকালেও	–	কোনো সময়েই, কখনও।
টীকাভাষ্য	–	মন্তব্যসহ ব্যাখ্যা ও মন্তব্য।
নিগূঢ়	–	দুর্জ্ঞেয়, গভীর ও প্রচ্ছন্ন।
তত্ত্ব	–	কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বা বিদ্যা, মতবাদ, Theory।
সবর্ণ	–	সম রং বিশিষ্ট।
সগোত্র	–	একই গোত্রভুক্ত।
শবচ্ছেদ	–	শবদেহ কেটে পরীক্ষা করা, মড়া কাটা।
অনুভূতিসাপেক্ষ	–	অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করতে হয় এমন।
তর্কসাপেক্ষ	–	তর্কের মাধ্যমে বিচার বিবেচনা করতে হয় এমন।

উৎস ও পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যায়। পরে তা তাঁর 'প্রবন্ধসংগ্রহ' (১৯৫২) সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধে সাহিত্যচর্চার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখকের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকলকে আনন্দ দান করা, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য হয়ে পড়বে স্বধর্মচ্যুত। অন্যদিকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য শিক্ষা দান করাও নয়। কারণ পাঠ্যবিষয় মানুষ পড়ে অনিচ্ছায় এবং বাধ্য হয়ে। পক্ষান্তরে সাহিত্যের রসাস্বাদন করে মানুষ স্বেচ্ছায় ও আনন্দে। তা ছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানের বিষয় জানানো; পক্ষান্তরে সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনে সাড়া জাগানো।

লেখকের মতে, সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা চলে খেলাধুলার। খেলাধুলায় যেমন নিছক আনন্দই প্রধান, সাহিত্যেও তাই। খেলাধুলায় যেমন আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, সাহিত্যের উদ্দেশ্যও তেমনি-একমাত্র আনন্দ দান করা।

❑ প্রবাদ, প্রবচন ও বাগধারা

রসাতলে গমন	- অধঃপাতে যাওয়া।
ডানায় ভর দিয়ে থাকা	- শূন্যলোকে ভাসা।
উপরি পাওয়া	- বাড়তি আয় উপার্জন।
আকাশ-পাতাল প্রভেদ	- বিস্তর পার্থক্য।
বাজারে কাটা	- বিক্রি হওয়া।
মতিগতি	- ভাবগতিক, মনের ভাব।
দা-কুমড়া সম্বন্ধ	- নিদারুণ শত্রুতার সম্পর্ক, বৈরী সম্পর্ক।

অনুশীলনমূলক কাজ

ভাষাশৈলী ❑ প্রমথ চৌধুরীর গদ্যশৈলী

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে সাধুরীতিই প্রচলিত ছিল। আমরা যে এখন গদ্যে চলিত রীতির ব্যবহার করছি তার প্রথম প্রবক্তা, সমর্থক ও আন্দোলনকারী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর আন্দোলনের প্রভাবে, পরে রবীন্দ্রনাথের মতো লেখকও চলিত গদ্যরীতিতে লিখতে শুরু করেছিলেন।

বাংলা গদ্যে প্রমথ চৌধুরী নিজস্ব আলাদা স্টাইল তৈরি করে গেছেন। অনেক জটিল ও গুরুগম্ভীর বিষয় তিনি এমন মজলিসি ঢঙে আলোচনা করেছেন যে, তাতে বিষয়বস্তু গুরুত্ব হালকা হয়নি অথচ তা হয়েছে দীপ্তিময় ও আকর্ষণীয়। তাঁর রচনায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাতে মননশীলতার সঙ্গে রয়েছে যুক্তিতর্কের ধারালো প্রকাশ। আর বক্তব্যের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্তর্কের ধারালো প্রকাশ। আর বক্তব্যের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যঙ্গের ঝাঁজ।

ভালোভাবে লক্ষ্য করলে প্রথম চৌধুরীর গদ্যশৈলী বা স্টাইলের কিছু বৈশিষ্ট্য তোমাদের চোখে পড়বে। যেমন।:

১. **কথ্য বাগভঙ্গি প্রয়োগ :**
'এক করতে আর হয় না', 'যা খুশি তাই করবার', 'টঙে চড়ে থাকতে চাই', 'সুর তারায় চড়িয়ে', 'বাহবা না পেলে', 'আর যাই কর না কেন', 'দা-কুমড়া সম্বন্ধ' ইত্যাদি।

২. **প্রবাদ জাতীয় বাক্য ব্যবহার :**
ক) যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন।
খ) কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ।

৩. **সুভাষিত উক্তি তৈরি:**
ক) সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়।
খ) শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো।
গ) সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।

৪. **অনুপ্রাসমণ্ডিত করে তরঙ্গায়িত ও ধ্বনিময় ভাষা সৃষ্টি :**
১. তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না।

২. পাথুরে কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র।
৩. লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করে বসেন।

৫. বাক্যের দুটি অংশে বিপরীতের সন্নিবেশ:
১. মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নিচুতেও নামতে চায়।
২. কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা।
৩. তারাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকি সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক।
৪. পাঠক সমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে।
৫. কাব্য জগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পরার্থ' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক. পারিতোষিক খ. মনোজগৎ
গ. পরোপকার ঘ. মনোরঞ্জন

২. লেখকের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কোনটি?
ক. সমাজের মনোরঞ্জন করা খ. অন্যের মনের অভাব পূর্ণ করা
গ. মানুষের মনকে জাগানো ঘ. মনকে বিশ্বের খবর জানানো

৩. সাহিত্য 'স্বধর্মচ্যুত' হয় তখন, যখন সাহিত্য চর্চা হয়-
ক. ফললাভের আকাঙ্ক্ষা শূন্য খ. জনসাধারণের সন্তুষ্টির জন্য
গ. জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ঘ. শিল্পীচিত্তের সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

৪. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে অনুচ্ছেদটির 'জ্ঞানের কথা'র সমার্থক ভাব হল-
i. খবর প্রদান
ii. পাঠকের মনতুষ্টি
iii. মুখস্থবিদ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধটি অনুসারে নিচের কোনটি অনুচ্ছেদের মূলভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ?
ক. মনের শূন্যতা পূর্ণ করাই সাহিত্যের লক্ষ্য
খ. কল্যাণ সাধন করা সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য
গ. প্রশংসা অর্জনের জন্য সাহিত্যের সৃষ্টি
ঘ. মনের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জ্ঞানের কথা জানা হয়ে গেলে আর জানতে ইচ্ছে করে না-তা জেনে মনে আনন্দও জন্মে না। সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে- এই তথ্য আমাদের মন টানে না। কিন্তু সূর্যোদয়ে যে সৌন্দর্য ও দেখার আনন্দ তা সৃষ্টিকাল থেকে আজও বিদ্যমান। এই সৌন্দর্য ও আনন্দানুভূতি পাঠক হৃদয়ে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ। পাঠ ও অনুধাবনের

মাধ্যমে রসিক পাঠকের হৃদয়ে তা সঞ্চারিত হয়। রস গ্রহণে অসমর্থ লোকই সাহিত্যে সৌন্দর্য আনন্দানুভূতির পরিবর্তে আত্মহিত ও সন্তুষ্টি খোঁজে। সাহিত্যে নির্মিত সৌন্দর্য-অনুভূতি যদি লোকহিত সাধন করে, তাতে সাহিত্যের কুললক্ষণ নষ্ট হয় না। শুধু লোকহিতার্থে ও সন্তুষ্টির জন্য প্রচেষ্টা সাহিত্যকে কুলত্যাগী করে, সাহিত্যিক শিল্পকে রূপান্তরিত হন।'

ক. 'রামায়ণ' কে রচনা করেছেন?

খ. 'অতি সস্তা খেলনা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'সাহিত্যের স্বধর্মচ্যুত' হওয়ার বিষয়টি উপরের অনুচ্ছেদে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

ঘ. 'শিক্ষা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে ভিন্নধর্মী'- বক্তব্যটি উপরের অনুচ্ছেদ কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর- উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২। মানুষের একটি আশা-আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নিজের অনুভূতি, উপলব্ধি অন্যের কাছে প্রকাশ করা। জয়নুল আবেদীনের মতো ছবি এঁকে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা গান লিখে নিজ হৃদয়ানুভূতি ও রূপচেতনা সে অন্য মনে ছড়িয়ে দিতে চায়। এভাবে সে জগতের সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। চায় লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে থাকতে। একাজ তখনই সফল হয়, যখন, রঙে, ঢঙে, আকার-প্রকারে, ভাষায়-সুরে, ছন্দে ইঙ্গিতে নিখুঁত রূপ বা অনুভূতি অন্যমনে প্রতিফলিত ও সঞ্চারিত করা যায়। এ কাজ যে পাবে, শিল্পরাজ্যের সেই রাজা, সমাজ ধর্মের জাতপাত, বর্ণভেদ সেখানে একাকার।

ক. রোদ্যাঁর একটি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নাম উল্লেখ কর।

খ. মানুষের দেহমনের সকল ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রবন্ধে বর্ণিত 'ব্রাহ্মণশূদ্রের' সমানাধিকার উপরের অনুচ্ছেদের কোন বক্তব্যে প্রতীয়মান হয়? আলোচনা কর।

ঘ. উপরের অনুচ্ছেদের 'লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা'- প্রবন্ধে বর্ণিত 'বিশ্বমানবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোরই নামান্তর'- তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা কাটে দারিদ্র্যের মধ্যে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বেশি তিনি লেখাপড়া করতে পারেননি। চব্বিশ বছর বয়সে মনের ঝোঁকে সন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সংগীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতির সূত্রে ঘটনাচক্রে এক জমিদারের বন্ধু হয়েছিলেন। জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন বর্মা মুলুক্ক।

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অজস্র উপন্যাসে। বিশেষ করে সমাজের নীচু তলার মানুষ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের অপূর্ব মানব-মহিমা নিয়ে চিত্রিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা কুন্স্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' নামে একটি গল্প। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ 'দেবদাস', 'পলীসমাজ', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ড্র 'দেনাপাওনা' ইত্যাদি। এসব উপন্যাসে বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর বহু উপন্যাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস বিদেশি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রি প্রদান করে। শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। তাঁর মৃত্যু কলকাতায় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে।

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ বারোজন। যাহাদেরই বাটী পলীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ড়একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্ড়করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়-চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা—সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্যা শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাঁদের ক্ষুধার জ্বালা, তাঁদের কথা না হয় নাই ধরিলাম কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে তো পলীর এত দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়া কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, ঐ চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে—পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধার রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই- দু ক্রোশের মধ্যে এমন আরও তো দু তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইছি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছের কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রং ধরিয়াছে, কার পুকুরপাড়ের খেজুরমেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা-কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে-এ সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কী জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ূনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ এবং আজ চলিশ্তর কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় একরমকই আছে-তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বেঁধে মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না-সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়-আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মুত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকা আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকা পোড়াবাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা-সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়-উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবংপ ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই-বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা তো দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এ কথাও কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না- গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়ো মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক দিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি- মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়াবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ড়সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ঐ মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আঠাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝড়িয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "কে, ন্যাড়া?"

বলিলাম, "হুঁ।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বসো।"

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনের দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন, সে কত বড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কত তাহার সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ড়আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ড়স একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তেড়আস্তেড়লিল, রাস্তড়পর্যন্ড়তামায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্তড়াগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা তো দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ড়দখা যায় না। বলিলাম, "পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।"

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তেড়আস্তেড়সে বলিল, "একলা যেতে ভয় করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?"

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না তো! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, "ঘন জঙ্গল পথ, একটু দেখে কপা ফেলে যেয়ো।"

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়তো সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্তমন সরিল না।

কুড়ি-পুঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় তো যে-কোনো মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্তরাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কী করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি- বাটীতে ছেলে-পুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তার সদ্যবিধমা স্ত্রী আর আমি। তার স্ত্রী তো শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কান্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেরই গ্রামের পাচজন যদি নদীর তীরের কোনো একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তো পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার তো আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই-অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভাই, যা হবার সে তো হইয়াছে, আর বাইরে গিয়া কী হইবে? রাতটা কাটুক না।"

বলিলাম, "অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।"

তিনি বলিলেন, "হোক কাজ, তুমি বসো।"

বলিলাম, "বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে"বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাপরে। আমি একলা থাকতে পারব না।"

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্তথাকতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্তমীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উলেস্নখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা

বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়তো তাহার কোনো সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোনো নরনারীর মাঝে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামি করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে ইহাদের দুঃখে গোপন অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনো মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়তো সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অত বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবর নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু একালে তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না- অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে-ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা-অ্যাঁ এ হইল কী? কলি কি সত্যিই উল্টাতে বসিল।

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর তো চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমিও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এই জন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়াবাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছিল। অকস্মাৎ লাঠিসোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটি সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোনো খুড়া কোনো কালে বোধ করি ভাইপোর-স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়েছে জানো?

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীরদর্পে হুংকার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রামস্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে।

এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি মেচ্ছদেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কী কথা সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে- রোগা মানুষ সমস্তরাত খেতে পাবে না।"

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্তরাকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় কিরয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্তঅন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক।

আপানারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামের উদারতার একান্তঅভাব। মোটেইনা। বরঞ্চ বড় লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাব হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে তো আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা- এ তো হাসিয়া উড়াইবার কথা। কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সেন্দশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে তো আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লীগ্রামের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে, তারাই তো একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া।

এই তো ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয়, স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধু মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয় এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্য গ্রামের বারোয়ারী পূজাবাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমনকি, পথে আসিতে অনেকেই দশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ দুই দূরের মালোপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটি কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালাকে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তর সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানি বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বণ করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুনো বুনিয়া বিক্রয় করে, শুয়ার চরায়। ভালো কায়স্থ সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে ছাগ কাটিয়া বিক্রয় করে- তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনো কালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই তো মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরস্বকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লীগ্রামের পুরস্বদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক। ঝোঁকের মাথায়, হয়তো বা অনধিকারচর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে যে আমি কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বই জন নরনারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির

করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরের জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, "তুমি না আগলালে সে রাত্রিতে আমাকে মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মান তুমি খেয়েছিলে।"

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখ্‌রো সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্লহইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুড়ের শিষ্য, সুতরাং মস্তলোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি অমনি নাছোরবান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কব্‌জিতে ওষুধ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমতো সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে-

-ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন-

মনসা দেবী আমার মা-

ওলটপালট পাতাল-ফোঁড়-

ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোড়ারে দে-

- দুধরাজ, মণিরাজ।

কার আজ্ঞা-বিষহরির আজ্ঞা

ইহার মানে যে কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন- নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন- তাঁর সাক্ষাৎ কখনও পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল ততদিন সাপ ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহংকারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুই জন। আমার গুরুযে, সে তো ভালো মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ংকর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো। বস্তুত বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসলে কথা হইতেছে এই যে, সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুই চারদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরুশিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পালাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত "দেখ, এমন করে মানুষ ঠকায়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, "সবাই করে- এতে দোষ কী?"

বিলাসী বলিত, "করুক গে সবাই। আমাদের তো খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই।"

আর একটা জিনিস আমি বারবার লক্ষ করিয়াছি। সাপধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকার বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি? মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার তো একরকম নেশার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই সাপের দ আমাকে একদিন ভালো করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেঝে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে-সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, "ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় একজোড়া তো আছে বটেই হয়তো বা বেশি থাকিতে পারে।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, "দেখছ না বাসা করেছিল?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে।"

বিলাসী কহিল, "দু-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছে আমি বলছি।"

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট-দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরা ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় 'উঃ' করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পালাবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত মুখ বাহির করিয়া দর্শন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্ত তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি তো ছিলই, তাহার উপরেও আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই "বিষহরির আজ্ঞা" মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও বা একসঙ্গে কখনও আলাদা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পালাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি পরে রোগী তাহার বাপ মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুড়ের দেওয়া মন্ত্রৌষধি সমস্তমিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনীটি আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও কোরো না।

আমার মাদুলি-কবচ তো মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালির বিষয় নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাব পিছাইয়া দাঁড়াইবনা, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, তো হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে তো তেমন আসে যায় না- না হয় একটু নিন্দাই হত। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু। গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কী! অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপরটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়তো ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই তো মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাতে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে এটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ড়সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপরটা যাহাদের শুধু নিছক Contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অনুপাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধবী গৃহিণী অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কলামাত্র হয়তো আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়তো নিতান্ড় একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের উপরকড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরই অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম স্বার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্ড়ীলোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দপোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশকটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সেন্দহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মতো বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মনুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মতো পাপ হয় না।

শব্দার্থ ও টীকা

মা-সরস্বতী	-	হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বীণাপাণি, বাণী।
কৃতবিদ্য	-	বিদ্যা অর্জন করেছেন এমন পন্ডিত, বিদ্বান।
বইচি	-	কাঁটাযুক্ত একরকম ছোট গাছ ও তার ফল।
রম্ভার কাঁদি	-	কলার ছড়া।
কানাচ	-	ঘরের পেছন দিককার লাগানো জায়গা।

খেজুর মেতি	-	খেজুর গাছের মাথার কাছের নরম মিষ্টি অংশ বা রস।
কামস্কাট্কা	-	প্রকৃত উচ্চারণ কামচাট্কা (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখটক সাগর ও উত্তর-পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য, তুন্দ্রা ও বনময়। বহু উষ্ণ প্রস্রবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে এখানে। প্রচুর স্যামন মাছ পাওয়া যায় বলে দ্বীপটি স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিতি। রাজধানী শহর-পোত্রোপাভ্লোভস্ক্।
সাইবেরিয়া	-	এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুন্দ্রা, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্তেপ্ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে।
এডেন	-	লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত।
পারশিয়া	-	পারস্য বা ইরান দেশ।
হুমায়ুন	-	মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট। তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের পিতা।
তোগলক খাঁ	-	ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন: গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক।
চল্লিশার কোঠা	-	চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত একটি সংখ্যা।
থার্ড ক্লাস	-	বর্তমান অষ্টম শ্রেণী। সেকালে মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণী হিসাব করা হত ওপর থেকে নিচের দিকে। দশম শ্রেণী তখন ছিল ফার্স্ট ক্লাস, নবম শ্রেণী ছিল সেকেন্ড ক্লাস।
প্রত্নতাত্ত্বিক	-	পুরাতত্ত্ববিদ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রালিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি।
ফোর্থ ক্লাস	-	এখনকার সপ্তম শ্রেণী।
সেকেন্ড ক্লাস	-	এখনকার নবম শ্রেণী।
গুলি	-	আফিমের তৈরি একরকম মাদক যা বড়ির মতো গুলি পাকিয়ে ব্যবহার করা হয়।
উপরের আদালতের হুকুমে-		স্রষ্টার নির্দেশে।
এমনি সুনাম	-	দুর্নাম বোঝাতে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

মালো	-	সাপের ওঝা। অনগ্রসর শ্রেণীবিশেষ। এরা সাপ ধরতে, সাপের কামড়ের চিকিৎসায় ও সাপের খেলা দেখাতে পটু। এসব করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।
সদ্ব্যয় করিয়াছি	-	অপব্যয় করেছি বোঝাতে ব্যঙ্গভাবে বলা হয়েছে।
কঙ্কালসার	-	অস্থিচর্মসার অবস্থা যেন প্রায় কঙ্কাল।
যমরাজ	-	মৃত্যু।
যে বস্তুটি	-	যে শক্তি অর্থে ব্যবহৃত।
উৎকণ্ঠিত	-	উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল।
আচ্ছন্ন	-	অভিভূত।
তিলার্ধ	-	তিল পরিমাণ সময়ের অর্ধ, মুহূর্তমাত্র।
প্রকৃতিস্থ	-	স্বাভাবিক।
চূড়ান্তমীমাংসা	-	শেষ নিষ্পত্তি।
জনশ্রুতি	-	লোকপরম্পরায় শোনা কথা, জনরব, লোকশ্রুতি।
সত্যযুগ	-	হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ যখন সমাজে অসত্য অন্যায় একেবারেই ছিল না বলে ধারণা।
রসাতলে গেল	-	অধঃপাতে বা উচ্ছন্নে গেল।
অকালকুষ্মাণ্ড	-	অসময়ে ফলেছে এমন কুমড়ো, অকর্মণ্য ব্যক্তি।
নিকা	-	বিয়ে। এখানে তাচ্ছিল্যসূচক প্রয়োগ।
কলি	-	হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। পুরাণ মতে, এ যুগে অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের বাড়াবাড়ি ঘটবে।
বদন দগ্ধ না হয়	-	মুখ যেন না পোড়ে, সুনাম যেন নষ্ট না হয়।
নীল বর্ণ হইয়া গেল	-	বিবর্ণ হয়ে গেল।
বীর দর্পে	-	বীরত্ব প্রকাশের জন্য তর্জন-গর্জন ও ভাবভঙ্গি করে।
নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে	-	কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একদিকে সর্বভারতীয় রাজারা একপক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নিরস্ত্র রথ-সারথি। সেখানে নারায়ণের নিরপেক্ষ আচরণ ছিল কাপুরুষসুলভ। সেই নারায়ণের পথাবলম্বীরাও আমাদের আচরণকে ভীরুতা বলতে লজ্জিত হবে। বাক্যাংশটিতে আসলে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে-আমাদের আচরণ এতই বর্বর ছিল যে তা কাপুরুষতার চেয়েও লজ্জাজনক ছিল।
বিলাত প্রভৃতি স্লেচ্ছদেশে	-	ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশসমূহে যেখানে হিন্দুসমাজের আচারধর্মের কোনো বালাই নেই।

http://zoaddar.org

সনাতন হিন্দু ও কুসংস্কার মানে না	-	এখানে হিন্দু ধর্মের সংস্কারাচ্ছন্নতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়েছে। নামে চিরন্তন বা সনাতন হলেও হিন্দুধর্ম যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচারসর্বস্ব, ধর্মীয় খোলস-সর্বস্ব ও সংকীর্ণতাচ্ছন্ন হয়েছে তার 'স্বরূপ প্রকাশের জন্যেই এই ব্যঙ্গ করা হয়েছে।
শ্রাব্য-অশ্রাব্য	-	শোনার যোগ্য ও অযোগ্য। এখানে শীলতা-অশীলতা।
অমার্জনীয়	-	ক্ষমার অযোগ্য।
কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া	-	নিচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করাকে লঘু ও ক্ষমার যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে আর অমার্জনীয় বলে গণ্য করা হয়েছে নিচু জাতের হাতে ভাত খাওয়াকে।
দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া	-	এখানে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে-দেবী সরস্বতীর প্রকৃত মান্যতার অভাবে এরা সংকীর্ণতাসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।
প্রাতঃস্মরণীয়	-	প্রাতঃকালে স্মরণ করার যোগ্য। অর্থাৎ অতি শ্রদ্ধেয়।
সেটা কাশীই বটে	-	কাশী ভারতের উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। সেখানে সাধু-সন্ড়পুণ্যার্থীর সমাবেশ যেমন হয় তেমনি দুশ্চরিত্র লোকজনের আখড়াও সেখানে জমে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূকে যেখান থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল তা কাশী হলেও তা যে তীর্থস্থান ছিল না বরং পতিতালয় বা অনুরূপ কোনো স্থান ছিল এখানে সেই ইঙ্গিতই করা হয়েছে।
বারওয়ারি	-	অনেকের সমবেত চেষ্টায় যা করা হয়, সর্বজনীন। বারোয়ারি।
সদক্ষিণা	-	পুরোহিতের সম্মানী বা সেলামি সহকারে।
ফলাহার	-	জলযোগ, ফলার।
ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল	-	সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।
মহত্তের কাহিনী	-	মহানুভবতার কথা। ব্যঙ্গার্থে নীচতার কাহিনী।
এন্ট্রান্স	-	প্রবেশিকা পরীক্ষা। বর্তমান মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য।
ধুচুনি	-	চাল ইত্যাদি ধোয়ার জন্য বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশের ঝুড়ি।
অবলীলাক্রমে	-	অনায়াসে।
পঞ্চমুখ	-	পাঁচ মুখে যে কথা বলে। মুখর।

পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে - ব্যঙ্গ করে সুখ্যাতি বলা হয়েছে। বস্তুত লেখক গ্রামের পুরুষদের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন।

মন্ত্রসিদ্ধ - মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করেছেন এমন। যার উচ্চারিত মন্ত্র অব্যর্থভাবে কার্যকর।

মনসা - হিন্দু ধর্মানুসারে সাপের দেবী।

মন্ত্রের দ্রষ্টা - যিনি প্রথম মন্ত্র লাভ করেন। মন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ লোকবিশ্বাস এই যে, মন্ত্র কেউ তৈরি করেন না। তা কোনো ভাগ্যবান দৈববলে পেয়ে থাকেন। যাঁর কাছে প্রথম মন্ত্র আবির্ভূত হয় তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা।

কামাখ্যা - ভারতের আসাম রাজ্যে অবস্থিত প্রাচীন তীর্থস্থান। তান্ত্রিক সাধক ও উপাসকদের তন্ত্রমন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত।

চক্র তুলিয়া - ফণা তুলিয়া।

খরিশ গোখরো - খুব বিষাক্ত এক প্রজাতির গোখরো সাপ।

বিষহরির দোহাই - মন্ত্রশক্তি।

বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম - মৃত্যুঞ্জয় নামের অর্থ যিনি মৃত্যুকে জয় করেন। বিষখণ্ঠ মহেশ্বরের অন্য নাম মৃত্যুঞ্জয়। কারণ বিষ রূপ মৃত্যু তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা মা তাদের পুত্রের নাম মৃত্যুঞ্জয় রাখলেও সে মৃত্যুকে জয় করতে পারল না। তার নাম মিথ্যা প্রতিপন্ন হল।

শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি - মৃত্যুঞ্জয় তার শ্বশুরের কাছ থেকে অমোঘ মন্ত্রৌষধি পেয়েছিল বলে জনশ্রুতি ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা - জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা হুকুম যা পালন করা বাধ্যতামূলক। ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলেও হুকুম বহাল থাকে।

বাঙালির বিষ - বাঙালির ক্রোধ বিদ্বেষ ইত্যাদি মুখের বাক্যেই সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী। তা সাপের বিষের মতো অব্যর্থভাবে কার্যকর নয়।

অপঘাত মৃত্যু - অস্বাভাবিক মৃত্যু। অপমৃত্যু।

পিণ্ডি - শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশ্যে দেয় চালের গোলাকার ডেলা।

ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু - মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে ব্রাহ্মণকে যে ভোজ্য উৎসর্গ করা হয় তা।

আত্মপ্রসাদ - নিজের মনে তৃপ্তি বা আনন্দলাভ।

বহুদর্শী	-	জ্ঞানী, অনেক দেখেছেন এমন। বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
ভূদেববাবু	-	ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ খ্রিঃ) উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ছিলেন। হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করে আধুনিক মানস গঠনের লক্ষ্যে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' ইত্যাদি এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী।
অতিকায় হস্তীড়	-	মহাগজ, mammoth। হাতির এই প্রজাতি বর্তমান কালের হাতির চেয়ে অনেক বড় ছিল। এই প্রজাতির হাতি প্রাণিজগৎ থেকে লুপ্ত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন রয়ে গেছে তাদের কঙ্কালে।

❑ বাগ্‌ধারা, প্রবাদ ও প্রবচন

লাভের অঙ্কে শূন্য	-	ফলাফল একেবারেই লাভজনক না হওয়া।
কাঁটা দেওয়া	-	বাধা সৃষ্টি করা।
বুক ফাটা	-	হৃদয়বিদারক।
রসাতলে যাওয়া	-	অধপাতে যাওয়া।
অকালকুষ্মাণ্ড	-	অকর্মণ্য, অকেজো। পরিবারে অনিষ্টকারী ব্যক্তি।
পঞ্চমুখ	-	প্রশংসামুখর হওয়া।
নাছোড়বান্দা	-	উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মরিয়া হয়ে পিছু লেগে থাকে এমন লোক।
দোহাই মানা	-	নজির দেখানো।
পাথর হয়ে যাওয়া	-	স্তব্ধ হয়ে পড়া।
মাথা হেট করা	-	লজ্জায় বা বিনয় মাথা নত করা।

উৎস ও পরিচিতি

শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিঃ) বৈশাখ সংখ্যায়। ।

'বিলাসী' গল্পটি 'ন্যাড়া' নামের এক যুবকের নিজের জবানিতে বিবৃত গল্প। এই গল্পের ন্যাড়া চরিত্রে শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার ছায়াপাত ঘটেছে।

'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত হয়েছে দুই ব্যতিক্রমশীল মানব-মানবীর চরিত্রের অসাধারণ প্রেমের মহিমা যা ছাপিয়ে উঠেছে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমাকে।

গল্পের প্রধান চরিত্র কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমতী ও সেবাব্রতী বিলাসী, শরৎসাহিত্যের অন্যান্য উজ্জ্বল নায়িকাদের মতোই একজন। যে প্রেমের জন্যে নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ আর তাঁর প্রেমের মহিমাময় আলোয় ধরা পড়েছে অনুদারতা ও রক্ষণশীলতা, সমাজ জীবনের নিষ্ঠুর ও অশুভ চেহারা।

অনুশীলনমূলক কাজ

সাহিত্যবোধ ❑ ছোটগল্প সম্পর্কে লেখা

যে কোনো ছোটগল্প সম্পর্কে লিখতে হলে সেটি বারবার পড়তে হয়। গল্পের প্রথম পাঠে মূলত রসাস্বাদন হলেও এক্ষেত্রে পরের পাঠগুলো হবে বেশ সতর্ক ও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক-যাতে গল্পের কাঠামো, কাহিনী, কথকের চরিত্র, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

❑ কাঠামো ও কাহিনী

গল্পটি কীভাবে গঠিত হয়েছে লক্ষ কর। গল্পে একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটে তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে গল্পের কাহিনী বা প্লট। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংঘাতের মাধ্যমেই কাহিনী অগ্রসর হয় সাধারণত গল্পের কাহিনীর একটা সূচনা, মধ্যাংশ ও সমাপ্তি থাকে এবং দ্বন্দ-সংঘাতে কাহিনীর গতি সঞ্চারিত, উৎকণ্ঠা প্রখর হয় এবং তারপর একটা চূড়ান্তমুহূর্তে কাহিনী শেষ হয়। কখনো কখনো কাহিনী শেষ হয় আকস্মিক বিপর্যয়, কোনো আনন্দঘন ঘটনায়ও কাহিনী শেষ হতে পারে।

❑ কথক বা বর্ণনাকারীর অবস্থান

লেখক কোন অবস্থান থেকে কাহিনী বলছেন, সেটা অনেক সময় কাহিনী বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখক সর্বদর্শী অবস্থান থেকেও কাহিনী বর্ণনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি সবগুলো চরিত্র ও ঘটনা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বর্ণনা করেন। যেমনটি দেখা যাবে কথাসাহিত্যিক শাহেদ আলীর 'এই সমতলে' গল্পে ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মনদীর মাঝি' উপন্যাস-অংশে। পক্ষান্তরে গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত হতে পারে। এক্ষেত্রে গল্পে আমি, আমাকে ইত্যাদি সর্বনাম এসে যায়। এ রকম ক্ষেত্রে লেখক নিজেই কাহিনীর একটা চরিত্রের ভূমিকা নেন। আমরা দেখেছি 'হৈমন্তী' গল্পে লেখক নিয়েছেন গল্পের কথক অপুর ভূমিকা। এ রকম 'বিলাসী' গল্পে লেখক কাহিনী বর্ণনা করেছেন 'ন্যাড়া'র ভূমিকা নিয়ে। উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ রকম ক্ষেত্রে পাঠক ততটুকু দেখতে ও জানতে পারেন যতটা বর্ণনাকারী দেখাতে ও জানাতে পারেন।

গল্পের উত্তম পুরুষ বর্ণনাকরীর ভূমিকা প্রধানত পর্যবেক্ষকের। তাই সাধারণত সেটি কাহিনীর মূল বা প্রধান চরিত্র হয় না। কথক বা বর্ণনাকারীর অবস্থানগত ভূমিকা বোঝার জন্য ভেবে দেখ: 'হৈমন্তী' গল্পটি যদি অপুর জবানিতে না হয়ে হৈমন্তীর জবানিতে হয় এবং 'বিলাসী' গল্পটি ন্যাড়ার জবানিতে না হয়ে যদি বিলাসীর জবানিতে বর্ণিত হত তবে তা কতটা সার্থক হতো?

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কোনো কোনো গল্পে বর্ণনাকারী উত্তম পুরুষ তার নিজ জীবনের কাহিনীরই বিবরণ দেয়।

❑ পটভূমি বা পারিপার্শ্বিকতা

গল্পের ক্ষেত্রে পটভূমি বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'হৈমন্তী' গল্পটির পটভূমিতে রয়েছে কেবল একটি পারিবারিক পরিমন্ডল। পক্ষান্তরে 'বিলাসী' গল্পের পটভূমিতে রয়েছে এই শতকের প্রথম দিককার পল্লীগ্রামের হিন্দুসমাজ। ছোটগল্পের পটভূমির গুরুত্ব বুঝতে হলে তুমি একটু ভাববে; ঘটনাগুলো কি অন্য কোথাও ঘটতে পারতো? গল্পে

বর্ণিত স্থানিক ও কালিক পটভূমি গল্পটিতে কী প্রভাব ফেলেছে? স্থানিক ও কালিক পটভূমি কি গল্পটির অপরিহার্য অংশ? না কি তাকে বাদ দিলে গল্পের ক্ষতি হয়? গল্পের বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে স্থানিক ও কালিক পটভূমি কি একেবারেই গুরুত্বহীন?

❐ চরিত্র

গল্প পাঠের সময় গল্পের চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে চরিত্রের সংলাপ ভালোভাবে খেয়াল করবে। কারণ চরিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয় চরিত্র যে ধরনের কথাবার্তা বলে তার মাধ্যমে। এর পরে দেখতে হবে, ঐ চরিত্র সম্পর্কে গল্পের অন্যান্য চরিত্র কী বলে? এছাড়া কোন চরিত্র কোন ঘটনায় কোন ধরনের আচরণ করে তার মাধ্যমেও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয়। এছাড়াও লেখক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চরিত্রের ভাবনাচিন্তা এবং অতীত আচরণ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকেন। চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে তাও বেশ সহায়ক হয়।

❐ গল্প বোঝার জন্যে সাধারণ কিছু প্রশ্ন

কোনো গল্প সম্পর্কে লেখার জন্য কিছু আত্মজিজ্ঞাসামূলক সাধারণ প্রশ্নের জবাব খোঁজা অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। যেমন-

১. প্রধান চরিত্র কোনটি? কাহিনী অগ্রসর হলে ঐ চরিত্রের কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় কি? সে কোন ধরনের লোক? তার জন্যে কি তোমার সহানুভূতি জাগে? কেন?

২. গল্পের কাহিনী কীভাবে বিন্যস্ত হয়েছে?

৩. গল্পে কি কোথাও চমক সৃষ্টি করা হয়েছে? সেটি কী? আগে কি সে সম্পর্কে কোনো আভাস পাওয়া যায়?

৪. গল্পের কালিক ও স্থানিক পটভূমি কী? গল্পে এগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ? অন্য কোনো কালে বা সময়ে গল্পের কাহিনীকে কি বিন্যস্ত করা চলে?

৫. গল্পের কথক বা বর্ণনাকারী কে? গল্পটি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কতটুকু? গল্পটি যদি অন্য কোনো চরিত্রের জবানিতে বলা হয় তাতে গল্পটি কি আরও সমৃদ্ধ হতো না আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

৬. গল্পের নামকরণ সামগ্রিক বিচারে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ বা সার্থক?

৭. এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু কী?

❐ ভাষা অনুশীলন

নেতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর:

নেতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে-

ক) কি, কী ইত্যাদি প্রশ্নবোধক সর্বনাম বা ক্রিয়া বিশেষণ যোগ করতে হয়।

খ) নেতিবাচক বাক্যের 'না' সূচক পদটি বাদ দিতে হয়। এবং

গ) বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন বসাতে হয়। যেমন:

নেতিবাচক : তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

প্রশ্নবাচক : তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?
নেতিবাচক : এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না।
প্রশ্নবাচক : এ খরব আমাদের কেহই কি জানিত?
নেতিবাচক : মানুষটা সমস্ড্রাত খেতে পাবে না।
প্রশ্নবাচক : মানুষটা সমস্ড্রাত খেতে পাবে কি?

প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর :

এক্ষেত্রে প্রশ্নবাচক বাক্য থেকে (ক) প্রশ্নবাচক অব্যয় (খ) প্রশ্নচিহ্ন বাদ দিতে হয় সেই সঙ্গে (গ) 'প্রশ্ন করছি' 'জিজ্ঞাসা করছি', 'জানতে চাই', 'মনে হচ্ছে', ইত্যাদি ক্রিয়াপদ প্রয়োজন ও সুবিধামতো ব্যবহার করতে হয়। (ঘ) স্বগত প্রশ্নে 'জানি না' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা চলে। যেমন-

প্রশ্নবাচক : তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন?
অস্তিবাচক : তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন জানি না।
প্রশ্নবাচক : কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী?
অস্তিবাচক : কাসস্কাটকার রাজধানীর নাম কী তা জানতে চাই।
প্রশ্নবাচক : একলা যেতে ভয় করবে না তো?
অস্তিবাচক : একলা যেতে ভয় করবে কি না জানতে চাই।

প্রশ্নবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর :

এক্ষেত্রে সাধারণত প্রশ্নবাচক বাক্য থেকে (ক) প্রশ্নবাচক অব্যয় বা ক্রিয়া বিশেষণ (কি, কী ইত্যাদি) (খ) প্রশ্নচিহ্ন বাদ দিতে এবং নেতিবাচক শব্দ (না, নয় ইত্যাদি) ও বাক্যের শেষে (গ) দাঁড়ি বসাতে হয় যেমন:

প্রশ্নবাচক : পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?
নেতিবাচক : পুলিশের লোক জানিবে না।
প্রশ্নবাচক : তাহারা কি পাষাণ?
নেতিবাচক : তাহারা পাষাণ নয়।
প্রশ্নবাচক : এতে দোষ কী?
নেতিবাচক : এতে দোষ নেই।

❐ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো'-উক্তিটি কার?
ক. মৃত্যুঞ্জয়ের খ. বিলাসীর
গ. ন্যাড়ার ঘ. খুড়ার

২. ন্যাড়াকে সাপ ধরার বিদ্যা শেখাতে বিলাসীর আপত্তি ছিল, কারণ কাজটি-
i. বিলাসীর অপছন্দের
ii. শক্ত ও ভীতিকর
iii. প্রতারণামূলক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. খুড়া গ্রামবাসীকে নিয়ে বিলাসীর ওপর হামলা করেছিল কেন?

ক. জাত রক্ষা জরুরি হয়ে পড়েছিলে খ. মিত্তির বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য
গ. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের প্রতি তার লোভ ছিলো ঘ. সাপুড়ে বিলাসীকে ঘৃণা করতো

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কল্পদ্রং জরুরি কাজে শহরে এসেছে। সকাল থেকে ঘোরাঘুরি করে ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চাইলে হোটেল মালিক বলল, 'আদিবাসীদের জন্য দুনম্বর বাসন আমার হোটেলে রাখি না'।

৪. কল্পদ্রং এর সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. খুড়া খ. ন্যাড়া
গ. বিলাসী ঘ. মৃত্যুঞ্জয়

৫. কল্পদ্রং এর প্রতি হোটেল মালিকের মনোভাব 'বিলাসী' গল্পের যে প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা হল-

i. অস্পৃশ্যতা
ii. অজ্ঞতা
iii. ব্রাহ্মণ্যবাদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

৬. বিলাসী লোক ঠকানো অপছন্দ করত, কেননা-

i. তাদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার ছিল
ii. এ পেশাটি ছিল ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ
iii. তার ছিল সৎভাবে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

❐ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সৌদামিনী মালো স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে ধানী জমি, বসতবাড়ি, পুকুরসহ কয়েক একর সম্পত্তির মালিক হয়। এই সম্পত্তির ওপর নজর পড়ে সৌদামিনীর জ্ঞাতি দেওর মনোরঞ্জনের। সৌদামিনীর সম্পত্তি দখলের জন্য সে নানা কৌশল অবলম্বন করে। একবার সৌদামিনী দুর্ভিক্ষের সময় ধান ক্ষেতের পাশে একটি মানবশিশু খুঁজে পায়। অসহায়, অসুস্থ শিশুটিকে সে তুলে এনে পরম যত্নে আপন সন্তানের মতো লালন পালন করে। মনোরঞ্জন সৌদামিনীকে সমাজচ্যুত করতে প্রচার করে যে, নমশূদ্রের ঘরে ব্রাহ্মণ সন্তান পালিত হচ্ছে। এ যে মহাপাপ, হিন্দু সমাজের জাত ধর্ম শেষ হয়ে গেল।

ক. 'বিলাসী' গল্পের বর্ণনাকারী কে?
খ. মৃত্যুঞ্জয়ের 'জাতবিসর্জনের' কারণ বর্ণনা কর।
গ. সৌদামিনী চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি বিলাসীর চরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মনোরঞ্জন যেন বিলাসী গল্পের খুড়ারই প্রতিচ্ছবি'- বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

http://zoaddar.org

২. সুধীর রায় কুলীন বংশের লোক। তার বাগান বাড়িতে কেশব নামের এক মালি কাজ করে। নীচু বংশের বলে তিনি মালিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। একদিন তিনি বাগান বাড়িতে তার বসার চেয়ারে মালিকে বসতে দেখে রাগান্বিত হন। তিনি তাৎক্ষণাত চেয়ারটি ভেঙে ফেলেন এবং তার রক্ষিকে দিয়ে মালিকে বেদম প্রহার করান। এর কিছুদিন পর এ বাগান বাড়িতে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কোনো যানবাহন পাওয়া গেল না। এ অবস্থায় কেশব অস্থির হয়ে পড়ে। সে সময়ক্ষেপণ না করে সুধীর রায়ের অজ্ঞান দেহটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। দীর্ঘ পথ পার হয়ে অবশেষে চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছায়। চিকিৎসা- সেবা পেয়ে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ক. বিলাসীর পারিবারিক পদবি কী?

খ. কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে খুড়া মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুধীর রায়ের আচরণে সমাজের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? 'বিলাসী' গল্প অবলম্বনে উত্তর দাও।

ঘ. কেশবের চারিত্রিক গুণাবলির আলোকে 'বিলাসী' গল্পে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নীচুতলার মানুষগুলোকে যে মানব-মহিমা দিয়ে চিত্রিত করেছেন তা প্রমাণ কর।

অর্ধাঙ্গী

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক পরিচিতি

বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী-জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া অন্তঃপুরবাসিনী জীবন শুরু করলেও সামাজিক সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল অতিক্রম করে বরণীয় হয়ে আছেন বিদ্যাচর্চায়, শিক্ষা-সংগঠন ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনে। অবরোধবাসিনীদের উন্মুক্ত বিশ্বে পদার্পণ করার যে আহবান জানিয়েছিলেন তিনি বিরাট ঝুঁকি নিয়ে, তা আমাদের সমাজজীবনে আজ সার্থকতা লাভ করেছে। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা তাঁর অসাধারণ কীর্তি। সমস্তপ্রতিকূলতার ভিতরে আপন উদ্যম ও প্রচেষ্টায় বেগম রোকেয়া ইংরেজি ও বাংলায় যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা বিস্ময়কর।

সমাজসেবা ব্রত হলেও রোকেয়া কলম ধরেছিলেন সমাজকে জাগানোর লক্ষ্যে এবং এভাবেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তীক্ষ্ণ, ঋজু গদ্যলেখক এবং সমাজসচেতন সাহসী সাহিত্যিক হিসেবে। ঠিক বেগম রোকেয়ার তুল্য লেখক সমকালীন হিন্দু বা মুসলমান, নারী বা পুরুষ আর কেউ ছিলেন না- বেগম রোকেয়া এমনই এক অদ্বিতীয় রচনারীতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর উলেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী', 'মতিচূর', 'সুলতানার স্বপ্ন' ইত্যাদি। ইংরেজি গ্রন্থ `Sultana's Dream' ও তারই রচনা। বেগম রোকেয়ার লেখা প্রকাশিত হতো 'মিসেস আর এস. হোসেন' নামে। তাঁর জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে। মৃত্যু ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে।

কোনো রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক। তাই অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবার পূর্বে তাহাদের অবনতির চিত্র দেখাইতে হয়। আমি 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে ভগিনীদিগকে জানাইয়াছি যে, আমাদের একটা রোগ আছে- দাসত্ব। সে রোগের কারণ এবং অবস্থা কতক পরিমাণে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, সেই রোগ হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কেমন বিকৃত হইয়াছে। ঔষধ পথ্যের বিধান স্থানান্তরে দেওয়া হইবে।

এইখানে গোঁড়া পর্দাপ্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু'একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে পর্দা-বিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে, আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।

সে প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উলেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধ বন্দিনী থাকেন? অথবা তাঁহারা পর্দানশীল নহেন বলিয়া কি আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের (enslaved মনে) আলোচনা করিয়াছি।

কোনো একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমত গোলযোগ উপস্থিত করে এবং পরে সেই নূতন চালচলন সহিয়া লয়, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্সি মহিলাদের পরিবর্তিত অবস্থার উলেখ করিয়াছি। পূর্বে তাঁহারা ছত্র ব্যবহারেরও অধিকারীণী ছিলেন না, তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু তো পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পার্সি মহিলাদের পর্দা মোচন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছি কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধি-বিবেচনার তো কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধি-বিবেচনার তো কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পার্সি পুরস্ত্রীগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পর্দার বাহিরে আনিয়াছে, ইহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির তো কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না- তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরস্ত্রী যখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরচরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরস্ত্রী যখন তাঁহাদের "নাকের দড়ি" ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পর্দার বাহির হইয়াছেন। ইহাতে রমণীকূলের বাহাদুরি কী? ঐরূপ পর্দা-বিরোধ কখনই প্রশংসনীয় নহে।

কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে কৃতসংকল্প হন, তখন লোকে তাঁহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কি?

পুরস্ত্রীগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোকে কালী, শীতলা প্রভৃতি রাক্ষক-প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে, সত্য। কিন্তু সেইরূপ বাঘিনী, নাগিনী, সিংহী প্রভৃতি 'দেবী'ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন-রমণী কালী, না রাক্ষসী নৃমুন্ডমালিনী?

নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দানশীল ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রানী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক-সবই।

কিন্তু রাম সীমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোনো বালকের যে-সম্বন্ধ. সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালোবাসিতে পারে,পুতুল- হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনীযাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারানো পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ, হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ। বালক তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে।

রামচন্দ্র 'স্বামিত্বের' ষোল আনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?-কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখায়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব-শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেননা, বুঝিয়া কার্য করিতে গেলে স্বামিত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইত না;- সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে পারা যাইত না। আচ্ছা, দেশ কালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় সুর মিলাইয়া না হয়

http://boiddar.org

মানিয়া লই যে, আমার স্বামীর দাসী নহি-অর্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে গৃহিণী, মরণে (না হয়, অন্ত তাঁহাদের চাকুরি উপলক্ষে যথাতথা) অনুগামিনী, সুখ-দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্য সহচরী ইত্যাদি।

কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কীরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছেন, তা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা 'প্রভুদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি-নতুবা এই নারীরূপ অর্ধাঙ্গ লইয়া তাঁহাদের কেমন অপরূপ মূর্তি হইয়াছে, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম।

শুকেশ বুদ্ধিমানগণ বলেন যে, আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের ন্যায়- এ শকটের এক চক্র-পতি, অপরটি পত্নী। তাই ইংরেজি ভাষার কথায় স্ত্রীকে অংশিনী ('partner'), উত্তমার্ধ ('better half') ইত্যদি বলে। জীবনের কত্যব্য অতি গুরুতর, সহজ নহে-

'সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালাতে
রাজ্য শাসনের রীতিনীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।'

বোধ হয় এই গার্হস্থ্য ব্যাপারটাকে মস্তকস্বরূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে তাহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়াছেন। তবে দেখা যাউক বর্তমান যুগে সমাজের মূর্তিটা কেমন।

মনে করুন, কোনো স্থানে পূর্বদিকে একটি বৃহৎ দর্পণ আছে, যাহাতে আপনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আপনার দক্ষিণাঙ্গভাগ পুরুষ এবং বামাঙ্গভাগ স্ত্রী। এই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখুন-

আপনার দক্ষিণ বাহু দীর্ঘ (ত্রিশ ইঞ্চি) এবং স্থূল, বাম বাহু দৈর্ঘ্যে চব্বিশ ইঞ্চি এবং ক্ষীণ। দক্ষিণ চরণ দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি, বাম চরণ অতিশয় ক্ষুদ্র। দক্ষিণ স্কন্ধ উচ্চতায় পাঁচ ফিট, বাম স্কন্ধ উচ্চতায় চারি ফিট। তবেই মাথাটা সোজা থাকিতে পারে না, বামদিকের ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। কিন্তু আবার দক্ষিণ কর্ণভারে বিপরীত দিকেও একটু ঝুকিয়াছে।) দক্ষিণ কর্ণ হস্তিকর্ণের ন্যায় বৃহৎ, বাম কর্ণ রাসভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ। দেখুন!- ভাল করে করিয়া দেখুন, আপনার মূর্তিটা কেমন!! যদি এ মূর্তিটা অনেকের মনোমত না হয়, তবে দ্বিচক্র শকটের গতি দেখাই। যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

সমাজের বিধি-ব্যবস্থা আমাদিগকে তাঁহাদের অস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছেন; তাঁহাদের সুখ-দুঃখ এক প্রকার, আমাদের সুখ-দুঃখ অন্য প্রকার। এস্থলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নবদম্পতির প্রেমালাপ" কবিতার দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম:

'বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া?
কনে। পুষি মিনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।
বর। কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে?
কনে। খেতেছি বসিয়া টোপা কুল।

বর। জগৎ ছানিয়া, কী দিব আনিয়া জীবন করি ক্ষয়?

তোমা তরে সখি, বল করিব কী?

কনে। আরো কুল পাড় গোটা ছয়

* * * * * * *

বর। বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?

কনে। দেব পুতুলের বিয়ে!'

সুতরাং দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্য সহচারী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর 'বোধোদয়' পর্যন্ড়

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহণক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সর্যমন্ডলের ঘনফল তুলাদন্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাউল ওজন করেন এবং রাঁধুনির গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্মিনী কই? বোধ হয়, গৃহিণী যদি আপনার সঙ্গে সূর্যমন্ডলে যান, তবে তথায় পুঁহুছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন। তবে সেথানে গৃহিণীর না যাওয়াই ভাল!!

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্যচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ-গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয় এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ.এ., বি.এ পাস হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে। তাহাদের বিদ্যা পরীক্ষা এ কথার সভ্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।

আমার জনৈক বন্ধু তাঁর ছাত্রকে উত্তর-দক্ষিণ প্রভৃতি দিকনির্ণয়ের কথা (cardinal points) বুঝাইতেছিলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'যদি তোমার দক্ষিণহস্ড়পশ্চিমে এবং বামহস্ড়পূর্বে থাকে, তবে তোমার মুখ কোন দিকে যাইবে?' উত্তর পাইলেন, 'আমার পশ্চাৎ দিকে।'

যাঁহারা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট 'পাহল-ওয়ান' দেখিতে চাহেন কি না? তাঁহাদের দৌহিত্র ঘুষিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা করেন কিনা? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহারা সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!! আর যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে দৌহিত্রও বলিষ্ট হয়, বরং পয়জার পেটা হইয়া নত মস্ড়কে উচ্চৈঃস্বরে বলে, 'মাৎ মারো" চোট লাগ্‌তা হায়!!' এবং পয়জার লাভ শেষ হইলে দূরে গিয়া প্রহারকর্তাকে শাসাইয়া বলে যে, 'কায় মারতা! চোট লাগ্‌তা হায়!!' তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে অক্ষম।

খ্রিষ্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন

বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্ধই (Better half) তাঁহার অংশীদার (Partner)-এর জবনে জীবন মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যান না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নতুন টুপির (bonnet-এর) চিন্তা করিতেছেন। কারণ তাঁহাকে কেবল মূর্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে- তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম। এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক; মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের 'অর্ধেক', অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা 'আড়াইজন' হই। আপনারা 'মহম্মদীয় আইনে' দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোনো ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিংবা জমিদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন, কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিক সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশি। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি কন্যার জন্য দুইজন শিক্ষায়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি. এ. পর্যন্ত) পাস করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাস (এন্ট্রান্স পাস ও এফ.এ. ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যা পাওয়াই যায় না। সে স্থলে ভ্রাতা "শমস-উল-ওলামা" সে স্থলে ভগিনী "নজম্-উল-ওলামা" হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুর গগনে অসংখ্য "নমজন্নেসা" "শাম্সন্নেসা" শোভা পাইতেছেন বটে। কিন্তু আমরা সাহিত্যগগনে "নজম-উল-ওলামা" দেখিতে চাই।

আমাদের জন্য এদেশের শিক্ষার বন্দোবস্ত আচরাচর এইরূপ-প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কুরআন শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মত আবৃত্তি কর। কোনো পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে "হাফেজা" করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কুরআনখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই "হাফেজ"। আমাদের আরবি শিক্ষা ঐ পর্যন্ত পারস্য এবং উর্দু শিখিতে হইলে, প্রথমে "করিমা ববখশা এ বরহালে মা" এবং একেবারে (উর্দু) "বানাতন্ নাস" পড়। একে আকার ইকার নাই, তাতে আবার আর কোনো সহজ পাঠ্যপুস্তক পূর্বে পড়া হয় নাই, সুতরাং পাঠের গতি দ্রুতগামী হয় না। অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই কন্যা-জীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকাভাবে, "যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল।" কোনো কোনো বালিকা রন্ধন ও সূচিকর্মে সুনিপুণা হয়। বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শেখে, কিন্তু কলম ধরিতে শেখে না। ইহাদের উন্নতির চরমসীমা সল্মা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতা-মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করতে শিক্ষা পর্যন্ত যদি ধর্মগুরু হযরত মুহাম্মদ (স.) আপনাদের হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, "তোমরা কন্যার প্রতি কীরূপ ন্যায় ব্যবার করিয়াছ?" তবে আপনারা কী বলিবেন?

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শোনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশি অত্যাচার-অনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসিগণ কন্যা হত্যা করিতেছিল, তখন হযরত মুহাম্মদ (স) কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান

হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ড়থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন- কন্যা কীরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।

আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা। তবে ভাই ভগিনীগণ! আমরা সকলে সমস্বরে বলি:"করিম ববখ্শ-এ বরহালে মা।" করিম (ঈশ্বর) অবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু "সাধনায় সিদ্ধি"। আমরা "করিমের" অনুগ্রহ লাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতার "অর্ধেক" নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ড়ইত যে পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানি হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক। সেরূপ তো নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহ-মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃ-হৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমনে বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?

আমি এবার রন্ধন ও সূচীকার্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আবার যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি সূচীকর্ম ও রন্ধনশিক্ষার বিরোধী। জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র। সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্যই শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশত নারী জাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না। কারণ, জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেকেই প্রত্যেকের নিকটপ কোনো-না-কোনো প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করের, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্যপ্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিণী কাদম্বিনীর "স্বামী", না কাদম্বিনী তরঙ্গিণীর "স্বামী"? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিস্টার ডাক্তারের সাহায্যপ্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিস্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিস্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিস্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে "স্বামী" বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন?

আমরা উত্তমার্ধ (beter halves) তাঁহারা নিকৃষ্টার্ধ (worse halves), আমরা অর্ধাঙ্গী, তাঁহারা অর্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবন-মরণের কাঠি আছে, যেহেতু "না জাগিলে সব ভারত ললনা" এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিংবা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃ মহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি না করেন।

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারতাম না? অশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি। অনেক সময় "হাজার হোক ব্যাটা ছেলে" বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এটাই তো ভুল।

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রিষ্টানকে খ্রিষ্টানি ছাড়িতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

অনেকে হয়তো ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটা পত্নী-বিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্যক্ষেত্র হইত তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন-শামলা, চোগা, আইন-কানুনের পাঁজি-পুঁথি লুঠিয়া লইবেন। অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে-নিশ্চিন্ত থাকুন।

পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাদপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষু ও ধনবান এই দুই দল লোক অলস; এবং ভদ্রমহিলার দল কর্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরাম-প্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। আমাদের হস্তমন, পদ, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ন একত্র হইলে ইহার উহার-বিশেষত আপন আপন অর্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাকপটুতা দেখায়। আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।

আশা করি এখন স্বামীর স্থলে "অর্ধাঙ্গ" শব্দ প্রচলিত হইবে।

শব্দার্থ ও টীকা

অবলা জাতি	-	বলহীনা। এখানে নারীসমাজ অর্থে ব্যবহৃত।
অবরোধ প্রথা	-	অন্তঃপুরে লোকচক্ষুর আড়ালে মেয়েদের আটক রাখার নিয়ম।
পার্সি	-	পারস্য দেশের অর্থাৎ ইরানি।
ছত্র	-	ছাতা।
বিলাতি সভ্যতা	-	পাশ্চাত্য সভ্যতা।
নাকের দড়ি	-	নাকাল ও বাধ্য করার অস্ত্র।
কলম্বস	-	ক্রিস্টোফার কলম্বস (১৪৪৭-১৫০৬) প্রসিদ্ধ ইতালীয় নাবিক এবং আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কর্তা। স্পেনের রাজদম্পতি ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সমুদ্র যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি কিউবা, বাহামা প্রভৃতি দ্বীপ এবং ক্রমে জ্যামাইকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি আবিষ্কার করেন।
বাতুল	-	পাগল, উন্মাদ।
স্বত্ব-স্বামীত্ব	-	অধিকার ও মালিকানা।
বাতুলতা	-	পাগলামি।
সীতা	-	রামায়ণে বর্ণিত মিথিলারাজ জনকের কন্যা ও রামচন্দ্রের পত্নী।

রামচন্দ্র	-	রামায়ণে বর্ণিত দশরথ ও কৌশল্যার পুত্র এবং সীতার স্বামী।
ধূলি-ধূসরিত	-	ধুলো লেগে মলিন।
অর্ধাঙ্গী	-	স্বামী-স্ত্রীকে পুরো পরিবারের একক হিসেবে কল্পনা করে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গী গণ্য করা হয়।
শুক্লকেশ	-	শুভ্র বা সাদা চুলবিশিষ্ট, পক্বকেশ।
শকট	-	গাড়ি, যান।
শাস্ত্রকার	-	শাস্ত্র-রচয়িতা, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ-প্রণেতা।
রাসভকর্ণ	-	গাধার কান।
'বোধোদয়'	-	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগ বইয়ের নাম। 'বোধোদয়' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে।
ওয়াড়	-	লেপ-বালিশ ইত্যাদির আবরণ।
তুলাদন্ড	-	দাঁড়িপাল্লা
চর্ব্যচোষ্য	-	চিবিয়ে, চুষে খেতে হয় এমন।
এফ.এ	-	First Arts। বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়।
পাহল-ওয়ান	-	পালোয়ান, কুস্তিগির।
পয়জার	-	জুতো, পাদুকা।
মাৎ মারো	-	মেরো না।
চোট লাগতা হায়	-	ব্যথা লাগছে।
কায় মারতা থা?		
হাম নালিশ করে গা!	-	কেন মারছিলে? আমি নালিশ করব!
তন্ময়	-	তাতে একান্তভাবে নিমগ্ন; তাছাড়া অন্য কোনো চিন্তা বা অনুভূতি নেই এমন।
অপার্থিব	-	অবস্তুগত।
হিতৈষিতা	-	হিতকামনা, কল্যাণসাধনের ইচ্ছা।
এনট্রান্স	-	প্রবেশিকা, বর্তমান মাধ্যমিক বা এসএসসি।
শমস-উল-ওলামা	-	জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপাধি। এই উপাধির অর্থ ওলামা বা জ্ঞানীদের মধ্যে সূর্য।
নজ্‌ম-উল-ওলামা	-	জ্ঞানীদের মধ্যে নক্ষত্র।
হিতৈষণা	-	কল্যাণ-ইচ্ছা।
হাফেজ	-	সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ যাঁর মুখস্থ এমন।
করিম ববখশা এ		
বরহালে মা	-	করিম বা আল্লাহ্ আমাদের এ অবস্থা দিয়েছেন।
সল্‌মা চুমকি	-	সোনা বা রূপার চকচকে পাকানো তীর বা বুটি দানা।

তরঙ্গিনী	-	নদী।
কাদম্বিনী	-	মেঘমালা।
সূত্রধর	-	ছুতার, কাঠের মিস্ত্রি।
তন্তুবায়	-	তন্তু বয়ন করে যে, তাঁতি, যে কাপড় বোনে।
শামলা	-	শালের এক রকম পাগড়ি, উকিলের পরিধেয় পাগড়ি।
চোগা	-	লম্বা ঢিলা বুক-খোলা এক ধরনের জামা যা চাপকানের উপরে পরা হয়।

উৎস ও পরিচিতি

'অর্ধাঙ্গী' রচনার উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে পুরুষশাসিত সমাজজীবনের সবক্ষেত্রে নারী, বিশেষ করে মুসলমান নারী সমাজের পশ্চাদপদতা, দুর্বহ জীবন ও অধিকারহীনতাকে দেখানো হয়েছে পুরুষের নিদারুণ স্বার্থপরতা, আধিপত্যকামী মানসিকতার প্রেক্ষাপটে। অত্যন্ড়ব্যথিত হৃদয়ে বেগম রোকেয়া আবেগধর্মী যুক্তিপ্রধান এই রচনায় নারীসমাজকে জ্ঞানচর্চা ও কর্মব্রত, অধিকার সচেতনতা ও মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় প্রবুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

এই রচনায় নারীজাগরণের পক্ষে যে সুচিন্ড়িত, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ মতামত তিনি ব্যক্ত করেছেন তাতে তাঁর মন্ড়ব্য আছে আবেগের গাঢ়তা আর যুক্তিতে আছে ধারালো তীক্ষ্ণতা। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজজীবনের অগ্রগতি ও কল্যাণ সাধনের জন্যে নারীজাগরণ এবং সেই সঙ্গে পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের বিকল্প নেই।

অনুশীলনমূলক কাজ

❑ গদ্যরীতি যুক্তি প্রদর্শন

কোনো কোনো লেখায় লেখক তাঁর নিজস্ব মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ ধরনের লেখায় তাঁর লক্ষ্য থাকে বক্তব্য বিষয়ে পাঠকের প্রত্যয় ও বিশ্বাস জাগানো। কখনো কখনো লেখক পাঠককে তাঁর (লেখকের) মতের পক্ষে টেনে আনতেও প্রলুব্ধ করে থাকেন। এ ধরনের লেখার মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যুক্তি প্রদর্শন।

লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যে যুক্তি হাজির করেন তার মধ্যে থাকে (ক) মূল বা প্রধান যুক্তি এবং (খ) আনুষঙ্গিক বা সহায়ক যুক্তি। লেখক এগুলো প্রদর্শন করেন অত্যন্ড়স্পষ্ট, জোরালো ও তীক্ষ্ণভাবে। আর সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হাজির করেন প্রাসঙ্গিক উদ্বৃতি, পরিসংখ্যান ও তথ্য-প্রমাণ ইত্যাদি।

যুক্তিপ্রয়োগধর্মী লেখায় লেখক প্রয়োজন মতো তুলনা, বর্ণনা, বিশেষণ, কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণ ইত্যাদি যে কোনো গদ্যকৌশল কাজে লাগাতে পারেন। তবে তিনি সাধারণত সেই কৌশল অবলম্বন করেন যাতে তাঁর যুক্তি জোরালোভাবে তুলে ধরা যায়। এ ধরনের গদ্য রচনার আলাদা কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে:

১. আবেগধর্মী যুক্তিতর্কমূলক রচনা হলেও মৌলিক তর্ক-বিতর্কের মতো নয়। কারণ, মৌলিক তর্ক-বিতর্ক অনেক সময় যুক্তি ছেড়ে মাথা গরম হওয়া ঝগড়ায় শেষ হয়। পক্ষান্ড়রে এ ধরনের লেখায় মূল বিষয়টি সব সময়

মনে রাখতে হয়। খেই হারানো চলে না। লেখক হয়তো বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে বলেন, (প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি যুযোপযোগী করা দরকার) কিংবা হয়তো তিনি কোনো ব্যাপারের সত্যতা প্রতিপন্ন করতে চান। ('শিক্ষার খাতে ব্যয় বাড়ালেই শিক্ষার মান বাড়ে না'), প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে যথাযথ, জোরালো ও অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বিপক্ষের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে আক্রমণ বা পাল্টা আক্রমণ তিনি করতে পারেন কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ আদৌ সঙ্গত নয়।

২. বক্তব্যকে যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রথম ও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে মূল প্রস্তাবনার ওপরে। কারণ সেটাই হল তার প্রতিপন্ন করার বিষয় এবং বিতর্কের ভিত্তি। সেটি উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যার পরেই আসবে মূল প্রস্তাবকে জোরালো করার পক্ষে সহায়ক ও আনুষঙ্গিক যুক্তি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ইত্যাদি।

৩. নিজের পক্ষে যুক্তি দেয়া ছাড়াও বিপক্ষের যুক্তি খন্ডনের দিকটিও দেখতে হয়। এ লেখার শুরুতে কিংবা মাঝামাঝি যুক্তি খন্ডনের কাজটি লেখককে সেরে নিতে হয়।

৪. কোনো যুক্তি বা মতামতের ভুল ব্যাখ্যা হবার আশংকা থাকলে প্রাসঙ্গিক জায়গায় লেখক তা উল্লেখ করে থাকেন।

৫. মূল বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণসহ যুক্তি প্রদান ও বিপক্ষের যুক্তি খন্ডন না করে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য, বিপক্ষের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ, যুক্তিহীন বিভ্রান্তিকর মতামত প্রদান ও মাত্রাতিরিক্ত আবেগ এ ধরনের লেখাকে ও লেখার উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।

ভাষা অনুশীলন ❑ বানান

–ইনি প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। এর ফলে শব্দের বানানে পরিবর্তন হয়ে থাকে। পুরুষবাচক শব্দ ও স্ত্রীবাচক শব্দের বানান লক্ষ কর;

বন্দী	-	বন্দিনী
অধিকারী	-	অধিকারিণী
প্রণয়ী	-	প্রণয়িনী
গৃহী	-	গৃহিণী
অনুগামী	-	অনুগামিনী
সমভাগী	-	সমভাগিনী।

বানান সতর্কতা

আবিষ্কার, বাষ্পীভূত, নিরীক্ষণ, ক্ষীণ, শীর্ষক, সূক্ষ্ম, দিকনির্ণয়, শিক্ষণীয়, শারীরিক, শ্রীমতি, ভগিনী, ভগ্নী, বন্দিনী, অধিকারিণী, প্রণয়িনী, গৃহিণী, অনুগামিনী, সমভাগিনী, কর্ণ, বর্ণনা, রমনী, সহচারী, অর্ধাঙ্গী, পত্নী, দর্পণ, গোঁড়া, বিদ্বেষ, উদ্দেশ্য, ধ্বংস, স্বত্ব-স্বামিত্ব, ব্যক্ত, অন্তঃপুর, জ্যোতির্বেত্তা।

-ইত প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষণ শব্দ

বিকার	>	বিকৃত	:	বিকৃত চেহারা
পরিবর্তন	>	পরিবর্তিত	:	পরিবর্তিত অবস্থা
ধূসর	>	ধূসরিত	:	ধূসরিত চেহারা
শোভা	>	শোভিত	:	শোভিত পতাকা
শিক্ষা	>	শিক্ষিত	:	শিক্ষিত লোক
প্রচলন	>	প্রচলিত	:	প্রচলিত শিক্ষা।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাগরের পানি বাষ্প হয়ে মেঘে পরিণত হয়। আবার সেই মেঘ বৃষ্টিকণা হয়ে সাগরে পতিত হয়। উপরের বাক্যগুলো দ্বারা বোঝানো হয়েছে-

ক. একে অপরের অনুসারী খ. প্রত্যেকে আমরা পরের তরে

গ. একের কর্তব্য অন্যের অধিকারঘ. প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট ঋণী

২. নারীদের শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কারণ এটা তাদের-

i. অকর্মণ্য করে তোলে

ii. মানসিক দাসত্ব প্রকাশ করে

iii. স্বামীদের আরামপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৩. 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বর্ণিত 'নাকের দড়ি' শব্দের অর্থ কী?

ক. অধিকার ও মালিকানার বস্তু খ. মেয়েদের আটক রাখার কৌশল

গ. তন্তু বয়ন করে তৈরিকৃত রশি ঘ. নতজানু ও বাধ্য করার অস্ত্র

নিচের কবিতাংশ পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর

৪. উপরের কবিতাংশের মর্মানুসারে নারীর সার্থক পরিচয় কোনটি?

ক. প্রণয়িনী খ. সহচরী

গ. অর্ধাঙ্গী ঘ. সমভাগিনী

৫. সামাজিক কল্যাণ সাধনে বেগম রোকেয়ার কোন আহবানটির সঙ্গে উপরের কবিতাংশের মিল আছে?

ক. নারীর মানসিক দাসত্ব মোচন খ. নারীর যথাযথ সম্মান প্রতিষ্ঠা

গ. নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করা ঘ. নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রেণু ও রাজু একই পিতা-মাতার সন্তান। কিন্তু তাদের পিতা-মাতা রাজুকে রেণু অপেক্ষা বেশি আদর যত্ন করে। দুই ভাইবোন খেতে বসলে বড় ভাগটা রাজু পায়। রাজু কোন অপরাধ করলে তাদের পিতা-মতা বেটা ছেলে বলে আমলে নেয় না। রাজুর জন্য গৃহশিক্ষক থাকলেও রেণুর জন্য তা রাখা হয় নি। রেণু যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে পিতা-মাতা তার বিয়ে দেওয়ার জন্য ততই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এতে রেণু আপত্তি করলে তার মা বলেন, মেয়েদের এত লেখাপড়া শিখে কাজ নেই, বরং ঘর-দোর সাজানো গোছানো, সুয়েটার বুনন এবং রান্না করাটা শিখে নিলে তা কাজে আসবে।

ক. 'শমস-উল-ওলামা' অর্থ কী?

খ. 'স্বামীর'স্থলে 'অর্ধাঙ্গ' শব্দটি প্রচলিত হওয়ার সুবিধা বর্ণনা কর।

গ. রেণুর পরিবারে নারীর যে অবস্থাটি ফুটে উঠেছে তা 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রেণুর মায়ের মনোভাবের মধ্যে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

২. শিরিন এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। বালিকা বয়সে তার স্কুলে যাওয়ার খুব শখ থাকলেও সে পারিবারিক শাসন ডিঙিয়ে স্কুলে যেতে পারে নি। মায়ের কাছে সে আরবি বর্ণমালা শিখেছে। এরপর কায়দা শিখে যখনই আমপারা শিখতে শুরু করে তখনই তার বিয়ের প্রস্তাব আসে। তার পিতা-মাতা কালবিলম্ব না করে মেয়ের বিয়ে দেয়। ভাগ্যগুণে শিরিন ভাল স্বামী পেয়ে যায়। সে স্বামীর সংসারে থেকে নিজের প্রচেষ্টা ও স্বামীর উৎসাহে বিদ্যা অর্জন করে। তাতে সে সমাজে নারীর হীন অবস্থা বুঝতে পারে। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সে নারীশিক্ষা কেন্দ্র করে তার এলাকার নারীদের শিক্ষিত করে তোলে।

ক. অবরোধ প্রথা কী?

খ. নারীর প্রতি পুরুষের কোন দৃষ্টিভঙ্গি 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার সমালোচনা করেন? বর্ণনা কর।

গ. শিরিন পিতৃ-পরিবারে নারীর প্রতি মনোভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিরিনের কাজের মধ্যে 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের ইচ্ছার কি কেনো প্রতিফলন ঘটেছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

যৌবনের গান

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে, ১৩০৬ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমান ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীর বাঙালির পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি'র মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'ছায়ানট', 'প্রলয়-শিখা', 'চক্রবাক', 'সিন্ধু-হিন্দোল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন, 'শিউলিমালা', মৃত্যু-ক্ষুধা', ইত্যাদি তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস। 'যুগ-বাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্র-মঙ্গল' ও 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন ধ্যানী। যাঁহারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রশ্মির ধারার মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষ্যে।

আমি কবি-বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়ে আন্ গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপন মনের আনন্দে- যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা, মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্তই দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই। কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে; যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায়, সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও না-ওয়াকিফ।

আমি বক্তাও নহি। আমি কমবক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী, বখতিয়ার খিলজি, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্তগত দ্রুতবেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন

অপেক্ষাও আমরা বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মতো অবিরল ধারায়। আমাদের কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ভীরু ঝরণাধারার মতো। ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীত গুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা ভাগীরথীর মতো খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী, আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে। আমার একমাত্র সম্বল-আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে, যৌবনকে আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি, সেদিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। জবা কুসুম সঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন। আমার প্রথম জাগরণ-প্রভাতে তেমন সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি জবা-কুসুম তাহার স্তুতি গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির-বিদারী, সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়, আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

বার্ধক্য তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে, বৃদ্ধ তাহারাই- যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয় যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচওয়াজ করিতে জানে না, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণ চঞ্চল শিশুদের কল কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার-বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি- যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়। বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসময়ের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল - করিম - মুসোলিন - সান ইয়াৎ সেনিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে-যাহারা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারকরূপে নব-পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার-ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিলসমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে, চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া

যায়। পবন-গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়ন-মণি নিভিয়া যায়-যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি-শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিখারী সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের সীমার উর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা-মুসলিম তরুণেরা-যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি-ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের ধর্ম-অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম, ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে-ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মোনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশত ও বেহেশতি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারীর মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব। ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

শব্দার্থ ও টীকা

দ্বিধা	-	সংকোচ, সংশয়, কুণ্ঠা।
রক্তের ধারা	-	রক্ত প্রবাহ।
অলক্ষ্যে	-	দৃষ্টির অগোচরে।
বায়স	-	কাক।
বেচারা গানের পাখিকে	-	কোকিলকে।
চঞ্চু	-	ঠোঁট।
অলসতন্দ্রা	-	আলস্য থেকে সৃষ্ট ঘুমের ভাব।
মোহনিদ্রা	-	আসক্তি বা মোহরূপ নিদ্রা, অচেতনতা, জড়তা।
দৈব	-	আকস্মিক।
পরিক্রমণ	-	পরিভ্রমণ, প্রদক্ষিণ।

http://zoaddar.org

ভরা-ভাদরে	-	পরিপূর্ণ ভাদ্রে। পরিপূর্ণ অবস্থায়। ভাদ্র মাসে নদীনালা বর্ষার জলে যেমন কানায় কানায় ভরে ওঠে তেমনি।
অগোচরে	-	অলক্ষে, দৃষ্টির বাইরে।
না-ওয়াকিফ	-	অনভিজ্ঞ, অজ্ঞাত।
কমবক্তা	-	অল্পভাষী, যিনি কম কথা বলেন।
বক্তিয়ার খিলজি	-	মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি ছিলেন ইতিহাসখ্যাত আফগান সেনানায়ক যিনি মাত্র সতেরো জন সৈন্য নিয়ে অতর্কিত আক্রমণে নদীয়া দখল করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন ভয়ে পলায়ন করলে বখতিয়ার খিলজি বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান রাজত্ব বিস্তার করেন। (১২০৩) এখানে কৌতুকভরে বক্তৃতাদানকারীকে 'বক্তিয়ার খিলজী' বলা হয়েছে।
লক্ষ্মণ সেন	-	বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা। অতর্কিত আক্রমণে বখতিয়ার খিলজি মাত্র সতেরো জন সৈন্য নিয়ে রাজধানী দখল করে নিলে রাজা লক্ষ্মণ সেন পেছনের দুয়ার দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এভাবে বাংলায় সেন বংশের পতন এবং মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়।
অভিভূত	-	ভাবাবেগে বিহ্বল, ভাবাবিষ্ট।
ছন্দের দুকূল	-	ভাব ও ভাষা বোঝাতে ব্যবহৃত।
জবাকুসুমসঙ্কাশ	-	জবাফুলের মতো।
প্রথম জাগরণ-প্রভাতে	-	সচেতনতার সূচনালগ্নে।
তিমিরবিদারী	-	অন্ধকার বিদীর্ণ করে যা, সূর্য।
আলোর দেবতা	-	সূর্য।
তিমিরকুন্তলা	-	অন্ধকার যার চুল, রাত্রি।
লীলাভূমি	-	বিচরণস্থান, ক্রীড়াক্ষেত্র।
জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া	-	সংস্কার ও প্রথাবদ্ধতার চাপে পিষ্ট হয়ে।
নাভিশ্বাস	-	মৃত্যুকালীন শ্বাসকষ্ট। মরণাপন্ন অবস্থা।
অগ্নিমান্দ্য	-	খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে হজম না হওয়ার রোগ, অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য।
উর্দি	-	কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ পোশাক।
জীর্ণাবরণ	-	জরাজীর্ণ আচ্ছাদন।
মার্তন্ডপ্রায়	-	সূর্যের মতো।
কালাপাহাড়	-	ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমানে ধর্মান্তরিত বিখ্যাত মুসলিম যোদ্ধা। সুলেমান ও দায়ুদ করবানির সেনাপতি, ওরফে রাজু। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী হন। ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে পুরী আক্রমণ করে বহু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেন। ইতিহাসে তিনি বিকট, ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের প্রতীক হয়ে আছেন।

কামাল - মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক পাশা (১৮৮১-১৯৩৮)। আধুনিক তুরস্কের জনক ও তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তাঁর পরিচালনা ও নেতৃত্বে তুরস্ক আসন্ন পতনের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং সত্যিকার উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা সবক্ষেত্রেই তিনি আমূল ও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। আইন-কানুন সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, পর্দা প্রথার উচ্ছেদ, স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি আধুনিক তুরস্কের ভিত্তি স্থাপন করেন। দেশবাসী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে তাঁকে 'আতাতুর্ক' বা 'তুরস্কের জনক' উপাধিত ভূষিত করেন।

মুসোলিনী - সিনর বেনিতো মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫) ইতালির একনায়ক এবং সেখানকার ফ্যাসিবাদী দলের নেতা ছিলেন। উগ্র জাত্যাভিমান থেকে তিনি ইতালিকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সমগ্র জাতীয় জীবনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং আগ্রাসী বৈদেশিক নীতির অনুসারী মুসোলিনি ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়া আক্রমণ করেন। এই ঘটনার সূত্রে ফ্যাসিবাদী হিটলারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৯৪০ সালে জার্মানির মিত্র হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে ইতালি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে ইতালির পরাজয় হলে তিনি পদচ্যুত ও বন্দী হন। পরে মুক্তি পেলেও আততায়ীর হাতে নিহত হন।

সানইয়াৎ - সান-ইয়াৎ-সেন (১৮৬৭-১৯২৫) চীনের জননন্দিত বিপ্লবী রাজনীতিবিদ ও নব্য চীনের জন্মদাতা। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় চীনের মাঞ্চু সম্রাটদের শাসন-শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিপ্লবী আন্দোলন হয়। সান-ইয়াৎ সেন এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১২ সালের বিপ্লবে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের পতন হলে তিনি নানকিং প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন। দ্বিতীয় বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে নির্বাসনে যেতে হয়। পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বিভক্ত চীনের দক্ষিণ চীন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন। সাম্যবাদ ও বিপ্লবে সুগভীর আস্থা, চীনের জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, মাঞ্চু রাজতন্ত্রের বিরোধিতা এবং সংস্কার নীতির জন্য চীনের ইতিহাসে তাঁর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

লেলিন - ভাদিমির ইলিচ উলিয়ানোফ (১৮৭০-১৯২৪) বিপ্লবী কাজে জড়িত থাকাকালে 'লেলিন' ছদ্মনাম নেন। তিনি রুশ বিপ্লবের সংগঠক, পরিকল্পক ও নেতা। তাঁর নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্যে জারের রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। ব্যাংক ও সম্পত্তি জাতীয়করণ, দরিদ্র জনগণের মধ্যে ভূমি বণ্টন, গণশিক্ষার প্রসার, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি রচনার মাধ্যমে তিনি ছিলেন প্রথম সফল মার্কসবাদী বিপ্লবী, মার্কসবাদী দর্শনের প্রথম কাতারের তাত্ত্বিক। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয়বহ হয়ে আছে।

নীল মঞ্জুষার মণি	-	সমুদ্রের এক রকম মূল্যবান রত্নপাথর।
যৌবনের মাতৃরূপ	-	যৌবনের কোমল সেবাপরায়ণ দিক।
মুরিদ	-	শিষ্য।
সংস্কারাতীত	-	সংস্কার বা মেরামত করা সম্ভব নয় এমন।
নেয়ামত	-	ধন-সম্পদ, অনুগ্রহ।

উৎস ও পরিচিতি

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জে মুসলিম যুব সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে তাদের উদ্দেশ্যে কাজী নজরুল ইসলাম যে প্রাণোচ্ছল ভাষণ দিয়েছিলেন, ' যৌবনের গান' রচনাটি তারই পরিমার্জিত লিখিত রূপ।

এই অভিভাষণে কবি দুরন্তদুর্বার যৌবনের প্রশস্তিউচ্চারণ করেছেন। কারণ যৌবন হচ্ছে অফুরন্তপ্রাণশক্তির আধার। তা মানুষের জীবনকে করে গতিশীল ও প্রত্যাশাময়। দুর্বার উদ্দীপনা, ক্লান্তিহীন উদ্যম, অপরিসীম ঔদার্য, অফুরন্তপ্রাণচঞ্চলতা ও অটল সাধনার প্রতীক যৌবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে সকল বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যায় সমাজ-প্রগতি ও নতুন স্বপ্নময় মুক্ত জীবনের পথে। আর বিপন্ন মানবতার পাশে সে দাঁড়ায় সেবাব্রতী ভূমিকা নিয়ে।

পক্ষান্তরে রক্ষণশীলতা, জড়তা, সংস্কারাচ্ছন্নতা ও পশ্চাৎপদতাময় বার্ধক্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় জীবনের প্রাণবন্ত অগ্রগতির পথে। তাই স্বভাব- বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যে যৌবন দেশ-জাতি-কাল ও ধর্মের বাঁধন মানে না সেই যৌবন-শক্তিকে কবি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন সমস্তজীর্ণ পুরনো সংস্কারকে ধ্বংস করে মনের মতো নতুন জগৎ রচনার সাধনায় অগ্রসর হতে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ভাষা অনুশীলন ❑ উপমা

কোনো জিনিসের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা বা সাদৃশ্য কল্পনা করা হলে তাকে বলা হয় উপমা। সাধারণত উপমা বোঝাতে মতো, ন্যায় ইত্যাদি সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ' যৌবনের গান' রচনায় প্রচুর উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

১. ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রশ্মির ধারার মতো গোপন ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষে।

২. আমি কবি-বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার।

৩. তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মতো অবিরল ধারায়। আমাদের বাণী বহে ক্ষীণ ভীরু ঝরনাধারার মতো।

ছেদ চিহ্ন : সেমিকোলন

সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ হচ্ছে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত এক ধরনের বাক্যাংশ চিহ্ন, যা ব্যবহৃত হয়:

১. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে।

ক) তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে। (বিলাসী)

খ) শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরেজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়। (বিলাসী)

২. বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য সমজাতীয় বাক্য পাশাপাশি প্রতিস্থাপন করলে:

বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন, শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ-স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।

ড্যাশ চিহ্ন

ড্যাশ চিহ্ন প্রধানত বাক্যের মধ্যে এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় :

১. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে:

ক) আমার একমাত্র সম্বল-আপনাদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান।

খ) বার্ধক্য তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়ে পড়িয়া থাকে।

২. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে:

ক) "বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না। একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে-"(হৈমন্তী)

খ) বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে-" (হৈমন্তী)

৩. গল্পে-উপন্যাসে প্রসঙ্গে পরিবর্তন বা ব্যাখ্যায়:

ক) শিশির-না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। (হৈমন্তী)

খ) অ্যাঁ-এ হইল কী, কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল? (বিলাসী)

৪. নাটক বা গল্প-উপন্যাসে সংলাপের আগে:

ক) -হ গীত না তর মাথা। (পদ্মানদীর মাঝি)

খ) -অপরাধ স্বীকার করলে?

-হ্যাঁ। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। (সৌদামিনী মালো)

সমাসমবদ্ধ শব্দ

মমতারস, অলসতন্দ্রা, মোহনিদ্রা, সৈন্যসামন্ত, সঙ্গীতগুঞ্জন, ঝরনাধারা, জবাকুসুমসঙ্কাশ, তিমিরবিদারী, যৌবনসূর্য, তিমিরকুমন্ত্রা, পাষাণস্তূপ, আলোকপিয়াসী, প্রাণচঞ্চল, মেঘলুপ্ত, জয়মুকুট, মার্তন্ডপ্রায়, নবপৃথিবী, সলিলসমাধি।

বানান সতর্কতা

পরিক্রমণ, তারুণ্য, বাণী, অরণ্য, মধ্যমণি মৃণাল, পাষাণ, জীর্ণ জীর্ণাবরণ, অপরিসীম, নিশীথিনী, লীলাভূমি, পূজারী, পীড়িত, ধ্যানী, তীক্ষ্ণ, ঝরনা, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিমান্দ্য, ঝঞ্ঝা, দ্বিধা।

http://zoaddar.org

সমোচ্চারিত শব্দে বানান পার্থক্য

অন্ন	-	ভাত।	পড়-পড়	-	পড়ন্ড়
অন্য	-	অপর।	পর পর	-	একের পর এক।
আসা	-	আগমন।	বাণী	-	কথা, উক্তি।
আশা	-	প্রত্যাশা, ভরসা।	বানি	-	গয়না তৈরির মজুরি।
বেশি	-	অনেক।	নিচ	-	নিম্নস্থান, বাড়ির নিম্নতল।
বেশী	-	বেশধারী। (ছদ্মবেশী)	নীচ	-	হীন, নিকৃষ্ট।
শব	-	মৃতদেহ	সকল	-	সব, সমস্ড়
সব	-	সমস্ড়	শকল	-	মাছের আঁশ।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক কী হয়ে তরুণদের মহাদান গ্রহণ করতে চান?
ক. মধ্যমণি খ. দলপতি
গ. সহযাত্রী ঘ. পূজারী

২. 'আমি কবি, বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার'- উক্তিটিতে বুঝিয়েছেন-
ক. যৌবনের উচ্ছলতা খ. মানব কল্যাণে ব্রত হওয়া
গ. তারুণ্যের প্রতি অকুণ্ঠ পক্ষপাত ঘ. গানের পাখির সাথে কবিতার তুলনা

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পূর্বকালে ইউরোপে আইন দ্বারা কুষ্ঠরোগীদের নির্বাসন দেওয়া হতো। মানবপ্রেমিক দানিয়েল যৌবনের ভোগলালসা ত্যাগ করে মালাকো দ্বীপে কুষ্ঠরোগীদের সেবায় ব্রতী হলেন, ঈশ্বরকে বললেন প্রভু! আজ আমার প্রেম সকল পূর্ণতায় সফল ও সার্থক হলো।

৩. অনুচ্ছেদে যৌবনের কোন বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক প্রতিফলন ঘটেছে?
ক. উদ্যম খ. ঔদার্য
গ. মাতৃরূপ ঘ. সাধনা

৪. কোন বাক্যে অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে?
ক. ইহারা থাকে শক্তির পিছনে
খ. রং ছাড়াইতে ছড়াইতে অস্ড়
গ. যখন দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়
ঘ. তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

'বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না বলে কিছু ছাড়াতেও পারে না- দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশ কোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

৫. এখানে ' যৌবনের গান' প্রবন্ধে বৃদ্ধের যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল-
i. পশ্চাদপদতা ii. রক্ষণশীলতা iii. স্থবিরতা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বার্ধক্যের বিপরীত ভাষা কোনটি?
ক. শক্তির পেছনে রশ্মির ধারার মতো গোপন
খ. সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে
গ. তরুণী অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির বিদারী
ঘ. অনন্তআকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অবসরপ্রাপ্ত ফারুক সাহেবের কাঁচা পাকা চুল, মুখে বয়সের ছাপ। তবে রাস্তার দুই ধারে গাছ লাগানো, রাস্তার গর্ত ভরাট করা ইত্যাদি কাজে তার কোনো ক্লান্তিনেই। এছাড়াও পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বাল্যবিবাহ রোধ, মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, অসুস্থ রোগীকে হসপিটালে পাঠানো এসমস্ত কাজেও তার উৎসাহের সীমা নেই।

ক. গানের পাখিকে তাড়া করে কে?
খ. 'আমি আজ তাহাদের দলে, যাহারা কর্মী নন- ধ্যানী'-এখানে 'ধ্যানী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. ফারুক সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যৌবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে-ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করে গড়িয়া লইব"- উক্তিটি ফারুক সাহেবের চরিত্রে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা ' যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর।

২. যুবকেরা পাগল, বারুদের মতো সহজেই যুবকপ্রাণে আগুন ধরে। তরবারি দেখে, কারাগারে ফাঁসিতে কিছুতেই তার দর্পিত প্রাণ কাবু হয় না। এদের মধ্যে স্থিরতা, বীরতা, গাম্ভীর্য, ধর্মভয়, বিনয় জ্ঞান বলতে কিছু নেই। ওরা সত্যিই পাগল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবদ্ধ শক্তি বলা যায়।
ক. বনের পাখির মতো গান করা কার স্বভাব?
খ. কবি তরুণদের দলভুক্ত হতে চেয়েছেন কেন?
গ. অনুচ্ছেদে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের যুবকের কোন রূপটির প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আংশিক বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে-মন্তব্যের যৌক্তিক মূল্যায়ন কর।

কলিমদ্দি দফাদার

আবু জাফর শামসুদ্দীন

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কাল ধরে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর পরিচয় কেবল গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে নয়। তিনি নাটক লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত।

তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে বিশেষ পরিচিতি ও আলোচিত হন 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' লিখে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে: 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'সংকর সংকীর্তন', 'প্রপঞ্চ', 'দেয়াল'। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে: 'আবুজাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'শেষ রাত্রির তারা', 'এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য', 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা' ইত্যাদি। তাঁর 'আত্মস্মৃতি' অসামান্য গ্রন্থ।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি জীবদ্দশায় 'বাংলা একাডেমী', 'মুক্তধারা' ইত্যাদি সাহিত্য পুরস্কার ও 'একুশে পদক' পেয়েছেন।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের জন্ম ঢাকা জেলার কালিগঞ্জে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে।

ঢাকা জেলার একটি বাৎসরিক পাম্পন অঞ্চল। শীতলক্ষ্যা নদীর দু'তীর ধরে মাইল দু'মাইল ভিতর পর্যন্ড়ডোবে না। বর্ষার আরো ভিতরে প্রবেশ করা মুশকিল। দু'মাইল যেতে পাঁচ মাইল ঘুরতে হয়। কোনো কোনো গ্রাম রীতিমত দ্বীপ হয়ে যায়। ঢুকতে নাও-কোন্দা লাগে। ছোট পানি পারাপার হওয়ার জন্য কোথাও বাঁশের সাঁকো, কোথাও কাঠের পুল আছে। ওগুলো পারাপার হতে ট্রেনিং আবশ্যক। অনভ্যস্থের জন্য প্রায় ক্ষেত্রে ওগুলো পুলসেরাত। সাঁকোতে উর্ধ্বপক্ষে দু'টো বাঁশ পাশাপাশি পাতা, নিচে জোড়ায় জোড়ায় আড়াআড়ি পোঁতা বাঁশের খুঁটি। ধরে চলার জন্য পাশে হালকা বাঁশ কখনও থাকেও না। মধ্যপথে যাওয়ার পর হয় তো দেখা গেল পায়ের নিচ মাত্র একটি বাঁশ। অন্যটি উধাও হয়ে গেছে। চড়ামাত্র সাঁকো মাঝিমালাহীন ডিঙি নৌকোর মতা বেসামাল নড়তে থাকে। কাঠের পুলের অবস্থাও প্রায় ওরকম। গর-ছাগল পারাপার হওয়ার ফলে এক বছরের মধ্যেই পুলের বারোটা বাজে। পায়ের নিচের চার তক্তা ভেঙে দু'তক্তা এমনকি এক তক্তাও হয়ে যায়। কোথাও তক্তা অদৃশ্য হয়ে যায়, পাশাপাশি দু'খ-বাঁশ স্থাপন করে সংযোগ স্থাপন করা হয়। দুর্বল খুঁটির ওপর স্থাপিত এসব কাঠের পুলে চড়ামাত্র বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো খটখট নড়ে। মোটকথা শতকরা আশিজন গ্রামবাসীর আর্থিক স্থিতিও বড় নড়বড়ে। পুলের নিচে অথৈ পানির স্রোত। পা ফসকে পড়লে বিপদ। সাঁতার না জানলে আরো বেশি বিপদ।

কলিমদ্দি এলাকার দফাদার। বিশ বাইশ বছর বয়সে ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদারিতে ঢুকেছিল। তখন হতে সে কলিমদ্দি দফাদার নামে পরিচিত। এখন বয়স প্রায় ষাট, চুল দাড়িতে পাক ধরেছে। বয়সকালে সে লাঠি খেলত। এখন সে লাঠি খেলে না, কিন্তু ঐতিহ্যরূপে বাবরি চুল রাখে।

চৌকিদারের সর্দার দফাদার গ্রামাঞ্চলের একটি মর্যাদাবান পদ। মর্যাদা সে পায়ও। লোকেরা তাকে দফাদার সাব ডাকে। কিন্তু পদমর্যাদার ভার তার বাড় বাড়ায়নি। তার আচার-আচরণ সহজ, সরল। হালকা সরসিতায় রসপটু। যৌবনে রাত জেগে পুঁথি পড়ত। সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা দিতে হয়। সেখানেও চৌকিদারের ওপরে তার মানমর্যাদা। বড় দারোগা এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মেম্বারেরা তাকে তুমি বলেন, শেষোক্তদের কেউ কেউ আপনি বলেও সম্মান করেন। চৌকিদারদের করেন তুই-তুমরি এমনকি যাচ্ছেতাই গালিগালাজও।

কলিমদ্দি দফাদারের বাড়ি বলতে একটি ছনের ঘর এবং তালপাতার ছাউনি দেয়া একটি একচালা পাকা ঘর, সামনে এক ফালি উঠোন। তার সামনে পাঁচকাঠা পরিমাণ জায়গা। সেটিতে সে 'আগুইনা' চিতার চাষ করে। লতার নিচের মূল কবিরাজি ওষুধের উপাদান। শহরের কারখানায় ভাল দাম পাওয়া যায়। চাষের জমি সামান্য। মাস-দু'মাসের খোরাকি হয়। বাকি সংবৎসর কিনে খেতে হয়। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে পাঁচজনের সংসার, বেতন সামান্য। কয়েকটি আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও পেঁপে গাছ অতিরিক্ত আয়ের উৎস। আর আছে একটি ছোট গাভী এবং স্ত্রীর একটি ছাগল ও মোরগ হাঁস দু'চারটি। বিয়োলে গাভীটি দেড় দু'সের দুধ দেয়। আধ সের রেখে বাকি সে সকালের বাজারে বেচে। এভাবে কায়ক্লেশে সংসার চলে। ধান-চালের দাম বাড়লে উপোস-কপোসও করতে হয়। কিন্তু কারো কাছে ধারকর্মের জন্য হাত পেতে দফাদার তার মর্যাদা খোয়ায় না। চরম দুর্দিনেও সে স্ফুর্তিবাজ মানুষ। বাজারের চা দোকানে বসে সে সকলের মতো রসিকতা করে, রসিকতার জাহাজ তার মস্তিষ্ক।

১৯৭১ সাল। ভাদ্রের শেষ। কানায় কানায় ভরা পাম্বনের পানি। যুদ্ধের পথমদিকেই খান সেনারা থানা সদর দখল করে নিয়েছিল। থানার কাছাকাছি ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে। কিছুদূর যেতে নদীর ওপর পুল। অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ওরা ভিতরেও প্রবেশ করেছে। কলিমদ্দি দফাদারের বোর্ড অফিস শীতলক্ষ্যার তীর বাজারে। নদীর ওপারে-ওপারে বেশ কিছু বড় বড় কল-কারখানা। ওগুলো শাসনের সুবিধার্থে একদল খান সেনা বাজারসংলগ্ন হাই স্কুলটিকে ছাউনি করে নিয়েছে। নদীর ওপারে মিলের রেস্ট হাউজে আর একটি ছাউনি। বাঁধন খুবই শক্ত। তবু কোনো কোনো রাত্রে গুলিবিনিময় হয়। কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতি আক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না। কখনও কখনও খতরনাম অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। হাটবাজারের লোকজন, মিল ফ্যাক্টরির শ্রমিক, দোকানদার স্কুল মাস্টার, ছাত্র সকলকে কাতারবন্দী করে বন্দুকের নল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, 'মুক্তি কিধার হ্যায় বোলো।' এক উত্তর ওরা জানে না।

অল্প দিন আগেই একটা খতরনাক ঘটনা ঘটেছে। বাজারের পশ্চিম-দক্ষিণে কয়েক ঘর গন্ধবণিক বাড়ুই জাতীয় হিন্দুর বাস। সে গ্রামের লোকেরা নদীর ঘাটে স্নান করে। কাপড় ধোয় এবং ভরা কলসী কাঁখে বাড়ি ফেরে। বাজারের অল্প দক্ষিণে ওদের ঘাট। ছায়াঘন বাঁশঝাড়, সুপারিগাছ, কলাগাছ, পানের বরজ প্রভৃতির ভিতর দিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অপ্রশস্থ সড়ক এঁকেবেঁকে এসে নদী ঘাটে নেমেছে। খান সেনারা বাজারের উত্তরে স্কুল ঘরে। হাট-বাজার এখন আর তেমন জমে না। খান সেনাদের গতিবিধি ও অবস্থানের খোঁজ-খবর নিয়ে বউঝিরা ঘাটে আসে। খোঁজখবর নিয়েই সেদিন মধ্যাহ্নে ঘাটে এসেছিল গরিব বিধবা হরিমতি এবং তার যুবতী মেয়ে সুমতি।

জায়গা জমি নেই। ওরা রাতভর ঢেঁকিতে চিড়া কুটে, দিনে মুড়ি ভাজে। চিড়া-মুড়ি বেচে ওরা দিন গুজরান করে। অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকিয়ে যায়, এ রকম একটা কথা আছে। দুর্ভাগ্য ওদের; সবে ভরা কলসী কাঁখে আর্দ্র বস্ত্রে নদীর ভাঙ্গুনতি ভেঙে ওপরে উঠে বাড়ির পথ ধরেছে ঠিক সে সময়টাতেই পাঁচজন যমদূতের চোখে পড়ে ওরা- মা মেয়ে। বন্দুক কাঁধে পাঁচজন খান সেনা সড়ক পথে দক্ষিণ থেকে এসে উপস্থিত হয় চৌরাস্ড়ার সংযোগ স্থলে।

হরিমতি ও সুমতি মাটির কলসী কাঁখ থেকে ফেলে পশ্চিম দিকে দৌড়! দৌড়! ছায়াঘন আঁকাবাঁকা পথে ওরা জীবনপণ দৌড়োচ্ছে তো দৌড়োচ্ছেই। আত্মরক্ষা করতেই হবে।

বন্দুক কাঁধে নিয়েই খান সেনারা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে। হরিমতি ও সুমতি এক নজর পশ্চাদ্দিকে তাকিয়ে আরো বেগে দৌড়ায়। আশপাশের লোকজন ঐ দৃশ্য দেখে বাড়িঘর ছেড়ে ঝোপে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে। পোয়াতী মেয়েরা ক্রন্দনরত শিশুর মুখ চেপে ধরে। আর্দ্র বস্ত্রে মাইলখানেক দৌড়োবার পর মা মেয়ে দু'জনের একজনও আর দৌড়োতে পারে না। রাস্ড়ার ডান দিকে প্রাইমারি স্কুল। আশ্রয়ের আশায় ওরা স্কুল ঘরে প্রবেশ করে।

স্কুল ঘর জনপ্রাণীশূন্য। দেয়ালে টাঙ্গানো ব্যাকবোর্ডে খড়ি মাটিতে কষা একটা অর্ধসমাপ্ত অঙ্ক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। একটা ছুঁচো ইঁদুর ওদের দেখে পালিয়ে যায়। চার চারটা দরজা এবং সবগুলো জানালা খোলা। হরিমতি, সুমতি ঢুকে দম নেয়ার আগেই খান সেনাদের বুটের দাপট শুনতে পায়। ওরাও কিছুক্ষণ দম নেয়। চারিদিকে প্রাচীর। সশস্ত্র শিকারী এবং শিকার দুইটাই ভিতরে। কিছুক্ষণ মা মেয়ের আর্তনাদ ওঠে। পরে নিঃশব্দ হয়ে যায় স্কুল ঘর। হরিমতি সুমতিকে ওরা হত্যা করে না। রক্তাক্ত অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে খান সেনারা রাইফেল কাঁধে স্কুল ঘর ত্যাগ করে।

রাস্ড়া পড়ে কয়েক পা এগোতেই গুলির শব্দ হয়। কোন দিক থেকে আসছে ঠাহর করার আগেই একজনের মাথার খুলি উড়ে যায়। 'মুক্তি আ গিয়া, ইয়া আলী' চিৎকার করে ফেরত বাকি চারজন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়। আরো একজনের উরুর মাংস ছিঁড়ে গুলি বেরিয়ে যায়। নিহত সঙ্গীকে পশ্চাতে ফেলে রেখে বাকি চারজন কোনক্রমে ছাউনিতে ফিরে আসে।

সেদিন থেকে এলাকায় মুক্তিফৌজ নিধন কাজ শুরু হয়। রোজ দল বেঁধে বেরোয় খান সেনারা। বাজারে মিলিটারি ঢোকার পর থেকেই কলিমদ্দি দফাদারের ওপর বোর্ড অফিস খোলার ভার পড়েছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান মিলিটারির ভয়ে পারতপক্ষে এদিকে আসেন না। মেম্বারগণও আত্মগোপন করেছেন। কিন্তু বোর্ড অফিস নিয়মিত খোলা রাখার হুকুম জারি আছে। কলিমদ্দি এ কাজ করার জন্য বাজারে আসে। খান সেনারা ওকেই ওদের অভিযানের সঙ্গী করে নেয়। সে সরকারি লোক, নিয়মিত নামাজ পড়ে এবং যা হুকুম হয় তা পালন করে। সুতরাং সান্দেহের কারণ নেই।

সেদিন থেকে দফাদার দিনের বেলা বাড়ি যেতে পারে না। বাজারেই খেতে হয় তাকে। খাওয়ার জন্য রোজ তিন টাকা পায় সে। খান সেনারা কি রাজাকারে ভর্তি করে নিয়েছে? মলিমদ্দি তার কিছু জানে না। সে তার স্বাভাবিক হাসিমুখে খান সেনাদের সঙ্গী হয়ে যেদিক যেতে বলে যায়। সে আড়-কাঠি, আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ডিউটি। বাজারের লোকজন কখনও কখনও তাকে অনুযোগ দেয়, দফাদার ভাই আপনেও?

কলিমদ্দি স্মিত হেসে সহজ উত্তর দেয়, আমি ভাই সরকারি লোক, যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালনকরি। এর বেশি একটি কথাও তার মুখ থেকে বের করা যায় না।

বুধবার। আশপাশে কোথাও হাটবার নেই। সকাল দশটায় কলিমদ্দি দফাদারের ডিউটি পড়ে। আজ ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা সড়ক পথে পশ্চিম দিকে মুক্তিবিরোধী অভিযান। আট-দশজন সশস্ত্র খান সেনা। কলিমদ্দি আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যস্থান.....গ্রাম। সেখানে নাকি বহু হিন্দুর বাস, আরো হিন্দু বাইরে থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুসলমানগুলোও ভারতীয় চর-কাফেরদের সঙ্গে এক জোট। আজ গ্রামটা শায়েস্তাকরতে হবে। আগুন দেয়ার মালমসলা, অস্ত্রও সঙ্গে আছে।

বেলা এগারটো। মাঠের ওপর দিয়ে অশ্রশস্ত্রমটে সড়ক। মাফ পেরিয়ে একটি গ্রাম। তারপরেই লক্ষ্যস্থল।

চকচকে রোদ। সড়কের উত্তরে রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে গামছা পরা এক কিশোর তির চারটে গরু খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় ছালা বোঝাই ঘাস। কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল। সম্ভবত সে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে।

মুক্তি! মুক্তি! একজন সৈনিক চিৎকার করে ওঠে।

কাঁহা? কাঁহা? অপরেরা প্রশ্ন করে।

ডাহনা তরফ দেখো।

কলিমদ্দি দফাদার সবিনয়ে বলতে চায়, মৃক্তি নেহি ক্যাপ্টিন সাব, উয়ো রাখাল হ্যায়, মেরা চেনাজানা হ্যায়। চুপ রাও সালে কাফের কা বাচ্চা কাফের। মুক্তি, আলবৎ মুক্তি। বলেই সকলে এক সঙ্গে গুলি ছোঁড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

কলিমদ্দি দফাদারের বাল্যকালের পাতানো দোস্তাইজদ্দি খলিফার ষোল বছরের ছেলে একবার মাত্র মা বলে। ধরাশায়ী দেহটা থেকে আর কোনো ধ্বনি কানে আসে না।

এক মুক্তি খতম। আভি সামনে চলো দফাদার।

জি, হুজুর, বলে সে হুকুম পালন করে।

ইতোমধ্যে খান সেনাদের পশ্চিমমুখী অভিযানের সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। গোলাগুলির শব্দ শোনার পর আশপাশের লোকজন ঘরবাড়ি ফেলে যে যেখানে পারে পালাতে শুরু করে। মাঠ পাড়ি দেয়ার আগেই সামনের গ্রাম সাফ হয়ে যায়।

পরের গ্রামে সেদিনের মূল যুদ্ধক্ষেত্র। সে গ্রামের পশ্চিমে অথৈ জলের বিস্তীর্ণ মাঠ। পানির ওপর বাওয়া ধানের সবুজ শীষ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্য ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়ে নাওদাঁড়া। গ্রামবাসীরা উঠিপড়ি নাও-কোন্দা বেয়ে অথৈ পানিতে ভাসমান উদ্ধত ধানের শীষের আড়ালে আত্মগোন করে। যারা নাও-কোন্দা পায় না তারা বিলে নামে এবং মাথার ওপরে কুচুরিপানা চাপিয়ে নাক জাগিয়ে ডুবে থাকে।

মুক্তি নিধন অভিযান এগিয়ে চলে। সামনে একটি লোকও পড়ে না। বাড়িঘর জনশূন্য, কলেরা মাহমারীতে বিরল জায়গার মতো মনে হয় পলীগ্র হাঁস মোরগ কুকুর-বিড়াল গোলাগুলির শব্দ শুনে আত্মগোপন করেছে। দড়িতে বাঁধা ছাগল-গরুদু'চারটা দেখা যায়।

ইয়ে বকরি বহুত খুবসুরত আওর তাজা, ওয়াপস জানে কে ওয়াকত.....সমজে....খান সেনাদের একজন সঙ্গীদের বলে।

হাঁ, হাঁ, এক ফিস্ট হু জায়েগা, অন্যেরা হেসে সমর্থন জানায়। ওরা পথের দু'ধারের বাড়িঘরে উঁকিঝুঁকি এবং ঝোপে জঙ্গলে গুলি ছুড়ে হদ্দ হয়। একজন মুক্তির সন্ধানও পাওয়া যায় না।

বেলা তখন বারোটা হঠাৎ কমান্ডার নির্দেশ দেয়, হল্ট! এক, দো!

সামনে কাঠের পুল। দু'দিক থেকে তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে খাড়া হয়ে কিছু দূরে ওঠার পর মাঝখানে সমতলে নিচে পাম্বিত খাল এবং দু'দিকের বাওয়া ধানের খেত, উদ্ধত ধানের শীষ পানির সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলছে। পুলের উত্তর-দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায় খাল এবং পাম্বিত ধানক্ষেত এঁকেবেঁকে স্থানে স্থানে অশ্বখুরের আকারে ভিতরে প্রবেশ করে এগিয়ে চলেচে। পুলের ওপর দিয়ে মানুষ এবং ছাগল-গরু পারাপার হয়, নিচে দিয়ে চলে নাও-কোন্দা। ঘন গাছপালা বেষ্টিত দু'পারের গ্রাম বেশ উঁচুতে। নবাগতের কাছে পার্বত্য অঞ্চল মনে হতে পারে। আসলে এটাই ভাওয়াল পরগণার ভূমিবিন্যাস বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় লোকদের কাছে উঁচু টিলাগুলো টেক নামে পরিচিত।

যুদ্ধস্থলরূপে নির্দিষ্ট সামনের গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরবাড়ি এপাড়ে দাঁড়িয়েও দেখা যায়। চৌচালা টিনের ঘরের টুয়া সুস্পষ্ট। পুলটা না পেরিয়ে ও গ্রামে প্রবেশ করার কোনো উপায় নেই। বর্ষাকালে গ্রামটা জলবেষ্টিত দ্বীপ। চলিয়ে হুজুর! কলিমদ্দি দফাদার বলে।

মগর! আওর কুই রাস্তা নেহি দফাদার? কমান্ডার জিজ্ঞাসা করে।

নেহি হুজুর! সেরেফ একহি রাস্তা বাকি চারো তরফ পানি। দফাদার জানায়। ইয়ে পুল আচ্ছা হ্যায়!

জি, হ্যাঁ, হুজুর, বহুত আচ্ছা হ্যায়। মানুষ গরু হামেশা পার হোতা হ্যায়।

মালুম হোতা পুলসেরাত। ঠিক হ্যায়; তুম আগে চলো দফাদার।

বহুত আচ্ছা হুজুর।

কলিমদ্দি দফাদার পুলের ওপর ওঠে। দু'তিন বছর আগে ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে, কিছু গ্রামবাসীর চাঁদায় তৈরি তিন তক্তার পুল। প্রায় জায়গায় নাট-বল্টু ঢিলা হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় গায়েবও হয়ে গেছে। ধরে চলার জন্য দু'দিকে বাঁশের ধরনি নেই। কাঠের খুঁটির গোড়ায় পচন ধরায় স্থানে স্থানে বাঁশের ঠিকা দেয়া হয়েছে। ওরপর বিছানো তক্তাও নরম, পচেও গেছে দু-এক জায়গায়, কিন্তু গ্রামের লোকের কাছে বিপজ্জনক নয়, আর যদি কখনও তক্তাসুদ্ধ নিচে পড়েই যায় কেউ সাঁতার কেটে পাড়ে উঠবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পুলের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে খালের জলে ঝাঁপুড়ি খেলে। আসলে পুলটা তেমন একটা নড়বড়ে নয়, মানুষ গরু ওপরে উঠলে কিছু কাঁপে-কাঁপালে আরো বেশি কাঁপে-কাঁপনি একটা সংক্রামক ব্যধি কিনা তাই।

কলিমদ্দি একপা দু'পা করে অতি সাবধানে এগিয়ে যায় এবং পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আইয়েন হুজুর। হুজুরেরা ওপরে ওঠেন না, পুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কলিমদ্দির পা দুটোর দিকে মনোযোগ দেয়। কলিমদ্দি দফাদার যত এগিয়ে যায়, তার পদযুগল নিপুণ অভিনেতার পদযুগলের মতো ঠকঠক কাঁপে, পুল কাঁপে দ্বিগুণ তালে।

উর্ধ্বারোহণ শেষে ওপরের সমতল জায়গাটুকু। সেখানকার তিন তক্তার একপাশেরটি পচে গেছে। তার একটি নাট বল্টুও নেই। নিচের বরগাটির কানা জায়গাটিও ফেটে গেছে।

কলিমদ্দি দফাদার কি ভেবে নিচের দিকে এক নজর তাকায়—খালের তীব্র স্রোত ছাড়া আর কোনো ঝামেলা নেই সেখানে। পরমুহূর্তে আর্তনাদের মতো কণ্ঠস্বরে 'মুক্তি মুক্তি' বলতে বলতে পচা তক্তাসমেত নিচে পড়ে যায়। খালের জলে একটা ঝুপ শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়। পজিশন নিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণের আগেই ধরাশায়ী হয় দু'তিনজন। তারপরেও কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয় পলায়ণ পথের দু'দিকে এলোপাতাড়ি। যে ক'জন যুদ্ধ করতে গিয়েছিল ছাউনিতে সে ক'জন অক্ষত ফেরে না।

কলিমদ্দিকে আবার দেখা যায় ষোলই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বাজারের চা স্টলে। তার সঙ্গীরা সবাই মুক্তি, সে-ই শুধু তার পুরনো সরকারি পোশাকে সকলের পরিচিত কলিমদ্দি দফাদার।

শব্দার্থ ও টীকা

নাও	-	নৌকা
কোন্দা	-	তালগাছ দিয়ে তৈরি নৌকা।
পুলসেরাত	-	পরকালের বিপজ্জনক সাঁকো বিশেষ।
দফাদার	-	চৌকিদারের সরদার।
বাড় বাড়া	-	ঔদ্ধত্য, বাড়াবাড়ি, স্পর্ধা।
'আগুইনা' চিতা	-	ভেষজ উদ্ভিদ বিশেষ।
খতরনাক	-	বিপজ্জনক, মারাত্মক।
গন্ধবণিক	-	গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী।
বাড়ুই	-	ঘরের চাল চাওয়া মিস্ত্রি।
খান সেনা	-	খান পদবিধারী সেনা অর্থাৎ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।
ভাঙ্গুনতি	-	নদীর পাড়ের ভাঙনশীর অংশ।
মুক্তি আ গিয়া	-	মুক্তিবাহিনী এসে পড়েছে।
রাজাকার	-	স্বেচ্ছাসেবক, মুক্তিযুদ্ধের পাকিস্তানি বাহিনীর সহায়তাকারী দালাল।
দফাদার তাই আপনেও	-	দফাদার ভাই, আপনিও শেষ পর্যন্ত দালালি শুরু করলেন?
মুক্তিবিরোধী অভিযান	-	মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাবিরোধী অভিযান।
রাইফেল রেঞ্জ	-	রাইফেলের গুলিবিদ্ধ করার আওতা।
মুক্তি! মুক্তি!	-	মুক্তিযোদ্ধা! মুক্তিযোদ্ধা!
কাঁহা? কাঁহা?	-	কোথায়, কোথায়?
ডাইনা তরফ দেখো	-	ডান দিকে দেখ।
নেহি	-	না, নয়।
উয়ো রাখাল হ্যায়	-	ও হচ্ছে রাখাল।
মেরা চেনাজানা হ্যায়	-	আমার চেনাজানা (আছে)।

চুপ রাও সালে কাফের

কা বাচ্চা কাফের - চুপ থাক, শালা কাফেরের বাচ্চা, কাফের।

মুক্তি, আলবৎ মুক্তি - মুক্তিবাহিনী, অবশ্যই মুক্তিবাহিনী।

আভি - এখন।

নাওদাঁড়া - নৌকা চলার ছোট খালের মতো পথ।

ইয়ে বকরি বহুত খুবসুরত

আওর তাজা, ওয়াপস জানে

কে ওয়াকত....সমজে... - এই বকরি ভারি সুন্দর আর তাজা, ফেরার সময়ে... বুঝেছে .....।

এক ফিস্ট হু জায়েগা - একটা ভাল ভোজ হয়ে যাবে।

টুয়া - ঘরের চালের শীর্ষ।

চলিয়ে - চলুন।

মগর! আওর কুই রাস্ড়

নেহি দফাদার? - কিন্তু অন্য কোনো রাস্ড়কি নেই, দফাদার?

নেহি হুজুর! সেরেফ একহি

রাস্ড় বাকি চারো তরফ পানি - না হুজুর! কেবল একটি মাত্রই রাস্ড় বাকি চার পাশে পানি।

ইয়ে পুল আচ্ছা হ্যায়? - এই পুল কি ঠিক আছে?

মালুম হো পুলসেরাত - মনে হচ্ছে যে পুলসেরাত।

ধরনি - ধরার অবলম্বন।

বরগার কানা জায়গা - আড়াআড়ি লাগানো কাঠের ভাঙা মুখ।

বাগ্‌ধারা প্রবাদ ও প্রবচন পাক ধরা - পেকে ওঠা, চুল দাড়ি ইত্যাদি সাদা হতে শুর“করা।

বাড় বাড়া - স্পর্ধা হওয়া।

যাচ্ছে তাই - যা ইচ্ছা তাই, অন্যায় বা অসংগত ব্যাপার, বিশ্রী, নিকৃষ্ট।

হাওয়া হওয়া - উধাও হওয়া, অদৃশ্য হওয়া।

খতরনাক অবস্থা - সংকটজনক অবস্থা।

কাতারবন্দি - সারিবদ্ধ করা।

অভাগা যেদিকে যায় সাগর

শুকিয়ে যায় - মন্দ ভাগ্যের লোক সর্বত্রই নিরাশ হয়।

এলোপাতাড়ি - বিশৃঙ্খলভাবে।

উৎস ও পরিচিতি

আবুজাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটি সংকলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প-সংকলন 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' থেকে।

এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার ছবি। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ছবি এই গল্পে বর্ণিত না হলেও তাদের দুর্বার প্রতিরোধ-তৎপরতা স্পষ্টত:ই কাহিনীতে অনুভব করা যায়। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম এলাকার আনসার, চৌকিদারেরাও যে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ কৌশলে অত্যন্ত্রগাপনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল সেই বাস্তবতাই শিল্প-সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে।

অনুশীলনমূলক কাজ

সাহিত্যবোধ □ রাজনৈতিক গল্প

যে সব রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া জাতীয় পালাবদল রচনা করে। শিল্পী সাহিত্যিকেরা সে সব ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহান ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যময় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাধা নিয়ে লেখা হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস, বহু ছোটগল্প ও অসংখ্য কবিতা।

লেখক যখন রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করেন, তখন অনেক সময় সাময়িক উত্তেজনার মোহ তাঁকে আচ্ছন্ন করে। আবেগের আতিশয্য ও ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি অনেক সময় সংযম হারিয়ে ফেলেন। ফলে তা সাময়িকভাবে জনপ্রিয় হলেও স্থানিক ও কারিক সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না।

কিন্তু সার্থক লেখক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লিখলেও তার লক্ষ্য থাকে মানব-হৃদয়ের গভীরতম সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা আবুজাফর শামসুদ্দীনের এই গল্পে রাজনৈতিক সংকটের যে চিত্র তাতে উত্তাল ঘনঘটা নেই, দ্বন্দ্ব–সংঘাতের আতিশয্য, দেশপ্রেমিকের ভাবোচ্ছ্বাস, কিংবা বীরত্বের বাহাদুরি। বরং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অমানবিক অন্যায়ের মুখে জনগণের অসহায়তা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ যুদ্ধের ইঙ্গিতময় উপস্থাপনা এবং কলিমদ্দি দফাদারের মনের গভীরে নিহিত প্রকাশহীন দেশপ্রেমের ছবি এঁকে লেখক রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে মানবজীবনের চিরায়ত মহিমাকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন।

□ ভাষা অনুশীলন

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর:

অস্তি	:	কোথাও তক্তা অদৃশ্য হয়ে যায়।
নেতি	:	কোথাও তক্তা অদৃশ্য না হয়ে যায় না।

অস্ড়ি	:	কাঠের পুলের অবস্থাও ওরকম।
নেতি	:	কাঠের পুলের অবস্থাও অন্যরকম নয়।
অস্ড়ি	:	ধান চালের দাম বাড়লে উপোস করতে হয়।
নেতি	:	ধান চালের ধাম বাড়লে উপোস না করে চলে না।

নেতিবাচক বাক্যকে অস্ড়িাচক 'বাক্যে রূপান্ড়র:

নেতি	:	এক পা দু পা করে না এগিয়ে পারে না।
অস্ড়ি	:	এক পা দু পা করে এগিয়ে যেতেই হয়।
নেতি	:	তক্তাসুদ্ধই সে নিচে না পড়ে পারল না।
অস্ড়ি	:	তক্তাসুদ্ধই সে নিচে পড়ে গেল।
নেতি	:	কলিমদ্দি সে সব জানে না।
অস্ড়ি	:	কলিমদ্দি-র সে সব অজানা।

বানান সর্তকতা ❑ চন্দ্রবিন্দু।

বাংলায় অনেক শব্দের চন্দ্রবিন্দু আসলে তৎসম শব্দের আনুনাসিক ধ্বনির (ঙ, ন, ম, ং) পরিবর্তিত রূপ। যেমন:

বাঁশ	<	বংশ	হাঁস	<	হংস
পাঁচ	<	পঞ্চ	কাঁপন	<	কম্পন
সাঁকো	<	সংক্রম	বাঁধন	<	বন্ধন
দাঁত	<	দন্ড়			

নিচের শব্দগুলোর বানানে চন্দ্রবিন্দু না দিলে ভুল হবে:

খুঁড়ি, দাঁড়ি, উঁচিয়ে, আঁকাবাঁকা, এঁকেবেঁকে, ঢেঁকি, কাঁধ, ছুঁতো, ইঁদুর, উঁচু, সাঁতার।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আগুইনা চিতা কী?

ক. হিংস্র প্রাণী বিশেষ
খ. ভেষজ উদ্ভিদ
গ. জ্বলন্ড়াশান
ঘ. ক্ষিপ্র যোদ্ধা

২. কলিমদ্দি দফাদারের বোর্ড অফিসটি কোথায়?

ক. সদর রাস্ড়াসংলগ্ন
খ. শীতলক্ষ্যার তীরে
গ. রেলস্টেশনের পাশে
ঘ. হাইস্কুলের পাশে

৩. কলিমদ্দি দফাদার তার কাজকে মর্যদাপূর্ণ মনে করার কারণ-

i. মেম্বাররা আপনি বলে সম্বোধন করতেন
ii. থানার দারোগা সম্মান করতেন
iii. দফাদারের কাজটি অনেক সম্মানের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. খানসেনারা খতরনাক অবস্থার মধ্যে পড়ত কেন?

ক. এ দেশের রাস্তাঘাট সম্পর্কে ধারণার অভাব।

খ. মুক্তিসেনার এলোপাথাড়ি আক্রমণের কারণে।

গ. তাদের সাঁতার জানা ছিলো না।

ঘ. তাদের গেরিলা ট্রেনিং ছিলো না।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

খালের ওপারে কাজলডাঙ্গা গ্রাম। সকালে গিয়ে দেখা গেল গ্রামটি লন্ডভন্ড। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভিটেগুলো খাঁ খাঁ করছে। পাশেই একটি খালের পাড়ে কিছু লাশ পড়ে আছে। রক্তের ধরা গিয়ে মিশেছে খালের পানিতে।

৫. বর্ণিত চিত্রকল্পটি 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের যে ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো-

i. খানসেনাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ

ii. মুক্তিযুদ্ধে শত্রুবাহিনীর অত্যাচার

iii. খানসেনাদের যুদ্ধের দক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. উলিল্লখিত ঘটনার কাব্যিক দিক নিচের কোন কবিতাংশে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারে খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক

খ. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েল্লেস রাইফেল আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।

গ. স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়

ঘ. স্বাধীনতা তুমি
পতাকা শোভিত শ্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. "তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস, বস্তিজবাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।"

ক. দফাদার পদটি কী?

খ. খানসেনারা কলিমদ্দি দফাদারকে তাদের অভিযানের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় কেন?

গ. কবিতাংশটির ২য় ও ৩য় চরণ 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের কোন দিককে নির্দেশ করে?

ঘ. কবিতাংশটি যেন "কলিমদ্দি দফাদার গল্পে কাব্যরূপ"-মূল্যায়ন কর।

২. বাংলার বর্ষা। ভিটেগুলো ছাড়া সমস্তগ্রাম পানির নিচে। কালু মাঝি দেশপ্রীতিতে বিশ্বস্ত খানসেনাদের অপারেশনে নিয়ে যায় সে নৌকা বেয়ে। নদীর ওপারে মুক্তিবাহিনী আস্তানা গেড়েছে। সেটা গুঁড়িয়ে দিতে হবে। খানসেনারা প্রস্তুত। অপারেশন হবে আজ রাতেই। কালু মাঝির ডাক পড়লো। ভরা জোয়ারের নদী। মাঝ নদীতে নৌকা। অস্ত্র আর খানসেনা বোঝাই নৌকাটি হঠাৎ দুলে উঠে কাত হয়ে গেল। আর্তনাদ করে নদীতে পড়ে গেল খানসেনারা। সাঁতরে কূলে উঠলো কালু মাঝি। ক্লান্তমুখে তার বিজয়ীর হাসি।

ক. চরম দুর্দিনেও কলিমদ্দি দফাদার কেমন মানুষ?

খ. 'দফাদার ভাই আপনেও?'-কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

গ. কালু মাঝি এবং কলিমদ্দি দফাদার এর পেশাগত পার্থক্য গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কালু মাঝি কলিমদ্দি দফাদার এর প্রতিচ্ছবি'- কলিমদ্দি দফাদার' গল্প অবলম্বনে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্

লেখক-পরিচিতি

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম রূপকার, সমাজসচেতন সাহিত্যশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউলাহ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের যোল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আহম্মদ উলাহ ও মায়ের নাম নাসিমা বেগম।

সৈয়দ ওয়ালীউলাহ ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশনসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। আনুষঙ্গিক কারণে ১৯৪৫ সালে এমএ পরীক্ষাদানে অক্ষমতা এবং একই সালে সহ-সম্পাদক হিসেবে কলকাতার কদর্ণদ্রিপ্রবটভ পত্রিকায় যোগদান এবং কমরেড পাবলিশার্স প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে ১৯৪৭ সালে। এরপর করাচি ও ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে চাকরি করেছেন। পরে পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক বিভাগে। কর্মসূত্রে নয়াদিলি; সিডনি, জাকার্তা ও লন্ডনে দায়িত্ব পালন শেষে দীর্ঘদিন প্যারিসে কর্মরত ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উলেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে-বিখ্যাত উপন্যাস 'লাল সালু' (১৯৪৮), 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮), 'উপন্যাস'; (১৯৫১), 'দুই তীর' (১৯৬৫), 'বহিপীর' (১৯৬৫), 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৬), 'সবুজ' (১৯৬৪) গল্পগ্রন্থ এবং 'বহিপীর' ও 'সুড়ঙ্গ' নাটক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বেকার অবস্থায় ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নেই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠান। তারপর পায়খানা-গোসলখানা পরে আম-জাম-কাঁঠাল গাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের স্নান অন্ধতকার এবং আগাছায় আবৃত মাটিতে ভাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হতো?

সে কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। তার বাগানের বড় শখ, যদিও আজ তা কল্পনাতেই পুষ্পিত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মতো করে নিতো। যত্ন করে লাগাতো মৌসুমি ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাসনাহেনা, দু-চারটে গোলাপ। তারপর সন্ধ্যার পর আপিস ফিরে সেখানে বসতো। এটু আরাম করে বসবার জন্যে হাল্কা বেতের চেয়ার বা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিতো। তারপরব গা ঢেলে বসে গল্প-গুজব করতো। আমজাদের হুকার অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো। কাদের গল্প-প্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনীময় হয়ে উঠতো। কিংবা পুষ্পসৌরভে মদির জ্যোৎস্নারাতে গল্প না করলেই বা কী এসে যেতো?

এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করতো তারা। আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হল না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্তই সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। সে ভয় কাটতে দেরি হয় না। সেদিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ- রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না। কোন অপরাধের চেতনা যদি বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাশ্রিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে, কী দেখছেন? জায়গা নাই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোট্ট ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই ফুট চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সববেদনার কণ্ঠে বলে,

আপনাদের তক্‌লিফ আমরা বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ। সেই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে সমবেদনা ভরা উক্তিতে।

ঐ ঘরটা?

নিচের তলার রাস্তার ধারে ঘরটা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখালেও খালি নয়। ভাল করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে সতরঞ্জিতে বাঁধা দুটো বেডিং। শেষ জায়গাটাও দু-ঘণ্টা হল অ্যাকাউন্টস এর মোটা বদরুদ্দিন নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানাপত্তর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোস্তের বাড়ির বারান্দার আস্তানা গেড়েছে। পরিবার না থাকলে সালাটিও এসে হাজির হত।

নেহাত কালের কথা। আবার একজনের কণ্ঠ সমবেদনায় খলখল করে ওঠে। যদি ঘণ্টা দুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানালার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে-আলোতেই দিব্যি চলে যাবে।

বা কিঞ্চনতা যদি করতে চায়-

অবশ্য এ-সব পরাহূত বাড়ি-সন্ধানীদের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথাসময়ে বেআইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করাবার জন্য পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমত মগের মুলুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে তারা ভাবে, পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে-কথা বিশ্বাস হয় না দু-দিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে বর্তমানে অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময় মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে নিষ্ফলভাবে বাড়ি দখলের ফিকিরে ছিল। মন্দভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না। ন্যায্য অধিকারস্বত্ব এক কথা, অন্যায়ের ওপর ভাগ্য লাভ অন্য কথা।

হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত-তো মনে হয়-ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা রুখে দাঁড়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইন-কানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়িওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

কাদের কেবল কাতর রব তোরে। যাবো কোথায়? শখ করে কি এখানে এসে উঠেছি? সদলবলে সাব ইনস্পেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক না বেহক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো ওপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝতে পারে, এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ি দখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে, সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বলো না কাউকে কিন্তু।

কথাটা অবশ্য কারোরই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটির গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উস্‌কানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় না।

উৎফুল্লকণ্ঠে কেউ প্রস্তাব করে, কী হে, চা-মিষ্টিটা হয়ে যাক।

রাতারাতি সরগরম হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড বাড়িটা। আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। -শুধু এ বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলা-মেলা ঝরঝরে তকতকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন-সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় বৈঠকখানা লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তুলনায় এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে মস্ত-মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান- এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন। এরা লাটবেলাটের মতো একখানা ঘর দখল করে নাই সত্য, তবু এত আলো বাতাস কখনো তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে, ধমনীতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দুহাজার ওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জৌলুস আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয়-ব্যাধিমুক্ত হবে। রোগাপটকা ইউনুস ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকালবেলার আবর্জনা ভরা ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে রান্নাঘরের

পাশে স্যাঁৎসেতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার বছর সে বাস করেছে। পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকতো যে রাস্তার ড্রেনের পচা দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছতো না, ঘরের কোণে ইঁদুর বেড়াল মরে পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউনুসের জ্বরজ্বারি লেগেই থাকতো, থেকে থেকে শেষরাতে কাশির ধমক উঠতো। তবু পাড়াটি ছাড়েনি এক কারণে। কে তাকে বলেছিল, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য তো করতোই, সময় সময় আপিস থেকে ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিছিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিশ্বাস নিতো। তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা যায় নাই।

খানাদানা না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধরে মুঘলাই কায়দায় তারা খানাদানা করে। রান্নার ব্যাপারে সকলেই গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় সহসা। নানির হাতে শেখা বিশেষ পিঠা তৈরির কৌশলটি শেষ পর্যন্ড়অখাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে ওঠে। গানের আসরও বসে কোনো কোনো সন্ধ্যায়। হাবিবুলাহ কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমনিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে নিজের গলার বলিষ্ঠতার ওপর ভর করে নিশীত রাত পর্যন্ড়একটি অবক্তব্য সঙ্গীতসমস্যা সৃষ্টি করে।

এ সময়ে একদিন উঠানের প্রান্ড়েরান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ হাত উঁচু ইটের তৈরি একটি মঞ্চের ওপর তুলসী গাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোববার সকাল। নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠারে পায়চারি করছিল, হঠাৎ সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্রাণ-শীতল-করা রৈ-রৈ আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার। তবু সে আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয়। শীঘ্রই কেউ কেউ ছুটে আসে উঠানে।

কী ব্যাপার?

চোখ খুলে দেখ!

কী? কী দেখবো?

সাপখোপ দেখবে আশা করেছিল বলে প্রথমে তুলসী গাছটা নজরে পড়ে না তাদের। দেখতো না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসী গাছটা দেখতে পাচ্ছে না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে। গাঢ় রঙের পাতায় খয়েরি রং ধরেছে। নিচে আগাছাও গজিয়েছে। হয়তো বহুদিন তাতে পানিব পড়েনি।

কী দেখছো? মোদাব্বের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফেল।

এরা কেমনব স্তব্ধ হয়ে যায়। আকস্মিক এ আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা-টা নাম সত্ত্বেও যে বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সে বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসী গাছটি হঠাৎ সে বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

এদের অহেতুক স্পর্ধা লক্ষ করে মোদাব্বের আবার হুঙ্কার ছাড়ে।

ভাবছো কী এত? উপড়ে ফেলো বলছি।

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভাল করে জানা নাই। তবুও কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে তুলসী গাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসী গাছের তলেও প্রতিসন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটা শান্তশীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকে নাই।

যে-গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী গাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? মতিন এক সময়ে রেলওয়েতে কাজ করতো। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে-পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পট্টিতে সে মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্নভাবে সে শাড়িটি দোলে স্বল্প হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসী তলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলমলকরে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি সর্দি ভাব। সে বলে,

থাক না ওটা। আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসী গাছ থাকা ভাল। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাব্বের অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যেন তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না। ওদের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আছে, সকালে নিয়মিতভাবে কুরআন-তেলাওয়াত করে। সে পর্যন্তুপ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি?

অক্ষত দেহে তুলসী গাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পর মুহূর্তেই অসচেতনায় নিমজ্জিত হয় না নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছ-পা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে, তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে থাকে। তারই ফলে সেদিন সান্ধ্য আড্ডায় তর্ক ওঠে। তারা বাকবিতণ্ডার স্রোত তো মনের দুর্বলতা অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আজ অন্যান্য দিনের মতো রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

-ওরাই তো সব কিছুর মূলে, মোদাব্বের বলে। উলঙ্গ বাল্ব-এর আলোয় তার সযত্নে মছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে। তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হলো।

কথাটা নতুন নয়। তবু আজ সে উক্তিতে নতুন একটা ঝাঁক। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অথ্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্তউপশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে। দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মকসূদ প্রতিবাদ করে। বলে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কী? মোদাব্বেরের ঝকঝক দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তাই হয়তো তার বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে দুলে কাঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পর রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুলসী গাছটা মোদাব্বেরের নজরে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার তলে যে আগাছা জন্মেছিল সে আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। সে গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রং ধরেছিল, সে পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে। মোদাব্বেরের হাতে তখন একটি কঞ্চি। সেটি সাঁ করে কচুকাটার কায়দায় সে তুলসী গাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিয়েই। তুলসী গাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসী গাছের কথা কেউ উলেখ করে না। ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসী পাতার রসেরতো প্রয়োজন হয় নাই তার।

তারা ভেবেছিল ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন বক্ষম্যানের জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুর আলো হাওয়ার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে। কিন্তু তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। তবে শুধু ততখানই দেরি হয় যতখানি দরকার, সে বিশ্বাস দৃঢ় প্রমাণিত হবার জন্য। ফলে আচম্বিত আঘাতটা প্রথমে নিদারুণই মনে হয়।

সেদিন তারা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালের পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছে এমন সময় বাইরে সিঁড়িতে ভারি জুতার মচমচ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবার উঁকি দিয়ে মোদাব্বের ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার। সে ফিসফিস করে বলে।

পুলিশ? আবার কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়তো রাস্তাথেকে ছ্যাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকেছে এবং তারই সন্ধানে পুলিশের আগমন হয়েছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খরগোশের গল্পের মতো ঠেকে। শিকারির সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাৎ চোখ বুঝে বসে পড়ে খরগোশ ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কি চোর নয়? সবজেনেও তারাই কি সত্য কথাটা স্বীকার না করে এ বাড়িতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্য।

পুলিশ দলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ। হাঁট বগলে চেপে সে দাগ-পড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পশ্চাতে বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটিকেও মস্তগোঁফ থাকা সত্ত্বেও নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে। তারা যেন কড়িকাঠ গোণে। ওপরের ঝিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়তো সে কবুতর দুটিকেই দেখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে, কাকে দরকার?

আপনাদের সবাইকে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট করে উত্তর দেয়। আপনারা বেআইনীভাবে এ বাড়িটা কব্জা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নেই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতূহল জাগিয়ে পুলিশরে নেতার দিক চেয়ে থাকে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম।

এরা নীরব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশেষে মোদাব্বের গলা সাফ করে প্রশ্ন করে কেন, বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে নাকি?

এ্যাকাউন্টস আপিসের মোটা বদরুদ্দিন গলা বাড়িয়ে কনেস্টবল দুটির পেছনে এক একবার তাকিয়ে দেখে বাড়িওয়ালার সন্ধানে। যেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

কোথায় বাড়িওয়ালা? না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশ দলেরর নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সঞ্চার হয় যেন।

তবে?

গভর্ণমেন্ট বাড়িটা রিকুইজশন করেছে।

এবার হাসি জাগে না। বস্তুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোনো কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়। আমরা কি গভর্ণমেন্টের লোক নই?

এবার কনেস্টবল দুটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়।

তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকাণ্ড সে বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেমে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানা রকম ব্রিদোহী ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুটি ধরে পড়ে থাকবে, যাবে তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেবে আসে সর্বত্র।

কোথায় যাবে তারা?

পরদিন মোদাব্বের যখন এসে বলে তাদের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা থেকে সাতদিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্বস্থির নিশ্বাস ছাড়লেও সে-ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার মোদাব্বের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা বলে না। তবু না বলা কথটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে থাকে খবর কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরোন দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি।

কেন পড়েনি সে কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।

শব্দার্থ ও টীকা

কংক্রিটের পুল	-	চুন-বালি-সিমেন্ট ও চুনা পাথরের মিশ্রণে তৈরি পাকা সেতু।
ক্যানভাস	-	মজবুত মোটা কাপড় বিশেষ।
ডেক চেয়ার	-	ঘরের বাইরে ব্যবহারের জন্য কাঠ বা ধাতুর কাঠামোর ওপর ক্যানভাস দিয়ে তৈরি সংকোচনযোগ্য আসন।
গুড়গুড়ি	-	আলবোলা, ফরাশ।
মদির	-	মত্ততা জাগায় বা সৃষ্টি করে এমন।
দেশভঙ্গের হুজুগে	-	১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় আবেগবশত।
ডেরা	-	অস্থায়ী বাসস্থান, আস্ড়া।
পরাহত	-	ব্যাহত, বাধাগ্রস্ড়পরাজিত।
ফিকির	-	ফন্দি, মতলব, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়।
না- হক	-	ন্যায়সঙ্গত নয় এমন।
না- বেহক	-	অন্যায় নয় এমন।
ঘোর- ঘোরালো	-	খুবই জটিল, অত্যন্ড়প্যাঁচালো।
রিপোর্ট	-	প্রতিবেদন।
আস্ড়া	-	বাসস্থান। আড্ডা।
লাটবেলাট	-	গভর্নর বা অনুরূপ সম্ভ্রান্ড়ব্যক্তিবর্গ।
জৌলুস	-	জেলাড় চাকচিক্য, ঔজ্জ্বল্য, জাঁকজমক।
কচ্ছদেশীয়	-	গুজরাটের উত্তরে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী স্থানের।
ইয়ার্ড	-	স্টেশন সংলগ্ন চত্বর।
সাম্প্রদায়িকতা	-	সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতা ও ক্রিয়াকলাপ।
বামপন্থী	-	সাম্যবাদী, প্রগতিবাদী, বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী।
রিকুইজিশন	-	কোন কিছু চেয়ে লিখিত ফরমাশ। তলব করা।
কড়িকাঠ	-	ছাদের তলায় দেয়া আড়াআড়ি লম্বা কাঠ।

বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচন

ভদ্রতার বালাই	-	সাধারণ সৌজন্যবোধ।
পৃষ্ঠ প্রদর্শন	-	পালানো।
দিনে দুপুরে ডাকাতি	-	প্রকাশ্যে প্রতারণা ও মিথ্যাচার, ডাকাতির মতো দুঃসাহসিক কাজ।
তুলোধুনো হওয়া	-	ধুনা তুলোর মতো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া।
কলা দেখানো	-	(আলংকারিক) ফাঁকি দেওয়া
মগের মুলুক	-	(আলংকারিক ব্যঙ্গ) অরাজকতা দেশ বা রাজ্য।

উৎস ও পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত। গল্পের সীমিত পরিসরে জীবনের গভীর কোন তাৎপর্যকে ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মুন্সিয়ানা রয়েছে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'-তেও এ গুণটি লক্ষ করা যায়।

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরপরই ঢাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন উদ্বাস্তু কর্মচারী। কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় কোন রকমে মাথা গুঁজে দুর্বিষহ জীবনযাপন করলেও নিরাশ্রিত উদ্বাস্তু জীবনের যে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা এতদিন তাদের গ্রাস করেছিল কলকাতার তুলনায় অনেক খোলামেলা বাড়ি পেয়ে তারা কেবল যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তা নয়, বরং বাড়িখানাকে তাদের কাছে মনে হলো বেহেশত। অচিরেই বাড়ির উঠানে আগাছার মধ্যে তারা আবিষ্কার করল একটি তুলসী গাছ। অন্য আর কোন চিহ্ন না থাকলেও এই একটি নিদর্শন থেকেই সবাই বুঝলো এ বাড়িটি আসলে একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি। সবাই প্রথমে গাছটাকে উপড়ে ফেলার জন্যে হৈ চৈ করলেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা দ্বিধাও জাগে এবং শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় তুলসী গাছটা। দেখা গেল সকলের অজান্তেকেউ একজন তার পরিচর্যা করতে শুরু করেছে। তারপর একদিন সরকারি নির্দেশে বেআইনি দখল থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হলো। শূন্য বাড়িটাতে রইল কেবল ছড়ানো ছিটানো পরিত্যক্ত আবর্জনা আর সেই তুলসী গাছটা। পানির অভাবে তুলসী গাছটা অচিরেই আবার শুষ্কপ্রায় হয়ে উঠল। যে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার হয়েছে অসংখ্য মানুষের শান্তজীবন তুলসী গাছটাও যে তারই শিকার—অসহায় গাছটা তা জানেন কী করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

সাহিত্যবোধ □ ছোটগল্পের সার্থকতা

কী হলে ছোটগল্প চমৎকার ও সার্থক হয় তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ছকবাঁধা পন্থা বা পদ্ধতি বা মানদণ্ড নেই। ভাগ্যিস তা নেই, তা না হলে একই ধরনের গল্প পড়তে গিয়ে আমরা একঘেয়েমিতে ভুগতাম। আসলে প্রতিটি সার্থক ছোটগল্পই অন্য যে কোনো গল্পের চেয়ে একেবারে আলাদা এবং সাহিত্যরসমণ্ডিত হয়ে থাকে।

ছোটগল্পে কোনো পাঠক চান বিনোদন, কেউ চান চমৎকার ভাববস্তু, কেউ চান অসাধারণ ও আকর্ষণীয় চরিত্র, কেউ চমকপ্রদ ঘটনা, কেউ চান কাহিনী, আবার কেউ চান উৎকণ্ঠা। এসব প্রত্যাশা স্বাভাবিক এবং তার কোনোটিকেই অযৌক্তিকও বলা যাবে না। কিন্তু ধরা যাক, কেউ হয়তো খুব চমকপ্রদ ঘটনার প্রত্যাশা নিয়ে একটা ছোটগল্প পড়লেন এবং শেষে দেখলে তেমন কিছুই তাতে নেই তবে কি ঐ ছোটগল্পটিকে সার্থক হয়নি বলতে হবে? এ ধরনের সিদ্ধান্তটা মুশকিল।

তাহলে ছোটগল্পের সার্থকতা আমরা কোন মানদণ্ডে বিচার করব?

কোন নির্দিষ্ট গল্পের সার্থকতার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বিচার করতে পারি গল্পের ব্যবহৃত উপাদানগুলো গল্পের পরিণতির সাথে যথাযথভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। গল্পে কাহিনী, চরিত্র, বিসয়বস্তু ইত্যাদির ব্যবহার কতটা সার্থক তা নির্ভর করবে এর ওপর। যে কোনো দক্ষ ও সৃজনশীল ছোটগল্পকার গল্পের প্রত্যাশিত সমাপ্তি উপযোগী করে গল্পের উপাদান ব্যবহার করে থাকেন। তাই যে কোনো ছোটগল্পের সার্থকতা বিচারে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে: গল্পটি বর্ণনারীতিতে কতটা সার্থক? বিষয়বস্তু ও নির্মাণ রীতির মেলবন্ধনে গল্পটি সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে কি না? এ সংকলনে সন্নিবেশিত গল্পগুলোর এক একটি এক এক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এক একটি গল্পের গঠনরীতি এক এক রকম। এগুলোর বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। আর সবচেয়ে বড়কথা এক একভাবে সেগুলো জীবনসত্যকে তুলে ধরেছে।

ভাষা অনুশীলন ❑ সমাসবদ্ধ পদ

গল্পপ্রেমিক	:	গল্প প্রেমিক যে	-	কর্মধারয়।
পুষ্পসৌরভ	:	পুষ্পের সৌরভ	-	ষষ্ঠী তৎপুরুষ।
জ্যোৎস্নারাত	:	জ্যোৎস্না- শোভিত রাত	-	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।
পৃষ্ঠপ্রগদর্শন	:	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	-	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।
দেশভঙ্গ	:	দেশকে ভঙ্গ	-	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।
জনমানব	:	জন ও মানব	-	দ্বন্দ্ব
দেশপলাতক	:	দেশ থেকে পলাতক	-	পঞ্চমী তৎপুরুষ।
আম-কুড়ানো	:	আমকে কুড়ানো	-	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।
অনাশ্রিত	:	নয় আশ্রিত যে	-	বহুব্রীহি।
সমবেদনা-ভরা	:	সমবেদনা দিয়ে ভরা	-	তৃতীয়া তৎপুরুষ।
মন্দভাগ্য	:	মন্দ যে ভাগ্য	-	কর্মধারয়।
		মন্দ ভাগ্য যার	-	বহুব্রীহি।
ন্যায়সঙ্গত	:	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	-	তৃতীয়া তৎপুরুষ।
জীবনসঞ্চার	:	জীবনের সঞ্চার	-	ষষ্ঠী তৎপুরুষ।
আবর্জনা-ভরা	:	আবর্জনা দ্বারা ভরা	-	তৃতীয়া তৎপুরুষ।
গানের আসর	:	গানের আসর	-	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ।
রান্নাঘর	;	রান্না করার ঘর	-	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।
		রান্নার নিমিত্তি ঘর	-	চতুর্থী তৎপুরুষ।
বেওয়ারিশ	:	বে(নেই) ওয়ারিশ যার	-	নঞর্থক বহুব্রীহি।
সন্ধ্যাপ্রদীপ	:	সন্ধ্যার প্রদীপ	-	ষষ্ঠী তৎপুরুষ।
জীবনপ্রদীপ	:	জীবন রূপ প্রদীপ	-	রূপক কর্মধারয়।
সুখময়	:	সুখের সময়	-	ষষ্ঠী তৎপুরুষ।
গৃহকর্ত্রী	:	গৃহের কর্ত্রী	-	ষষ্ঠী তৎপুরুষ।
বাকবিতণ্ডা	:	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	-	তৃতীয়া তৎপুরুষ।
অত্যাচার-অবিচার	:	অত্যাচার ও অবিচার	-	দ্বন্দ্ব।
শ্বাস-প্রশ্বাস	:	শ্বাস ও প্রশ্বাস	-	দ্বন্দ্ব।
কচুকাটা	:	কচুর মত কাটা	-	উপমান কর্মধারয়।
অক্ষত	:	নয় ক্ষত	-	নঞ তৎপুরুষ।
অবিশ্বাস্য	:	নয় বিশ্বাস্য	-	নঞ তৎপুরুষ।
বেআইনি	:	বে (নয়) আইনি	-	নঞ তৎপুরুষ।
অপর্যাপ্ত	:	নয় পর্যাপ্ত।	-	নঞ তৎপুরুষ।

❑ বাক্যান্তর :

অস্তি থেকে নেতি

অস্তি	:	সে কথাই এরা ভাবে।
নেতি	:	সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।
অস্তি	:	বাড়িটা তারা দখল করেছে।
নেতি	:	বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়ে না।
অস্তি	:	কথাটায় তার বিশ্বাস হয়।
নেতি	:	কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।
অস্তি	:	তবে নালিশটা অযৌক্তিক।
নেতি	;	তবে নালিশটা যৌক্তিক নয়।
অস্তি	:	সে তারস্বরে আর্তনাদ করে।
নেতি	:	সে তারস্বরে আর্তনাদ না করে পারে না।

নেতি থেকে অস্তি

নেতি	:	তারা যাবে না কোথাও।
অস্তি	:	তারা এখানেই থাকবে।
নেতি	:	কারো মুখে কোন কথা সরে না।
অস্তি	:	প্রত্যেকেই নীরব হয়ে থাকে।
নেতি	:	সেখানে কেউ নেই।
অস্তি	;	জায়গাটা নির্জন।
নেতি	;	কথাটা না মেনে উপায় নেই।
অস্তি	:	কথাটা মানতেই হয়।
নেতি	:	তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।
অস্তি	:	অচিরেই তাদের ভুল ভাঙে।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তুলসী গাছটি কোথায়?
ক. উঠোনের মাঝখানে খ. দেয়ালের পাশে
গ. রান্নাঘরের পেছনে ঘ. ফটকের বাইরে

২. 'হয়ত তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই'-কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক. মোদাব্বের খ. গৃহকর্ত্রী
গ. মকসুদ ঘ. ইনস্পেক্টর

৩. 'তুলসী গাছটি অক্ষত দেহেই থাকে' কারণ-
i. তার তলার আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে
ii. পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে
iii. তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'- গল্পে তুলসী গাছটি কীসের প্রতীক?

ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগের
খ. অর্থনৈতিক অচলাবস্থার
গ. সামাজিক অস্থিরতার
ঘ. রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের

৫. কলকাতা থেকে কিছু লোক এ দেশে চলে এসেছিল কেন?

ক. চাকরির সন্ধানে
খ. দেশভাগের কারণে
গ. দেশ ভ্রমণের লক্ষ্যে
ঘ. দেশপ্রেমের টানে

৬. পুলিশ আশ্রিতদের বাড়িছাড়া করেছে কেন?

ক. বাড়িওয়ালা আবার ফিরে আসায়
খ. বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হওয়ায়
গ. সরকার বাড়ি ছাড়ার হুকুম দেয়ায়
ঘ. বাড়ির মালিকানা হাতবদল হওয়ায়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বানের পানিতে ডুবতে ডুবতে রমিজ একটি গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরল। কিন্তু স্রোতের তীব্র টানে গুঁড়িটি তার হাতছাড়া হয়ে যায়। রমিজ ভেসে যায় বানের টানে ।

৭. গুঁড়িটি রমিজের হাতছাড়া হওয়ার সাথে গল্পে বর্ণিত কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়?

ক. সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করার
খ. তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলার নির্দেশের
গ. মতিনের বাগান করতে না পারার
ঘ. গৃহকর্ত্রীর কথা কারও মনে না পড়ার

৮. গাছের গুঁড়ির সাথে গল্পের কোন বস্তুটি তুল্য?

ক. তুলসী গাছের
খ. পরিত্যক্ত বাড়ির
গ নিমের ডালের
ঘ. কড়ি কাঠের

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পদ্মার বুকে চর জেগেছে। সেখানে নদীভাঙা অনেক মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা ঘর তুলেছে, গাছ লাগিয়েছে, চাষাবাদ করেছে। নিঃস্ব মানুষগুলো বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। অভাব-দারিদ্র্যের মাঝেও চর জীবনে একটা প্রশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঠিক এমনি সময়ে একদিন মহাজনের লাঠিয়ালরা চরে এসে হাজির হল। মহাজনের নির্দেশে তারা নিরীহ চরবাসীদের উচ্ছেদ করলো। মুখর চর আবার নিথর হয়ে পড়ল।

ক. তুলসী গাছটি প্রথম কে দেখতে পায়?

খ. 'ভাবছ কী অত? উপড়ে ফেলো বলছি'। এ কথা কেন বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত নদীভাঙা মানুষগুলোর সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের চরিত্রগুলোর যে মিল পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুখর চর আবার নিথর হয়ে পড়ল' অনুচ্ছেদে বর্ণিত এ ঘটনাটি 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে কীভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে বিশ্লেষণ কর।

২. খাঁচায় বন্দি টিয়া পাখিটির মুমূর্ষু দশা। কদিন ধরে দানাপানি নেই। এ বাড়িতে যারা থাকত, যুদ্ধের ডামাডোলে তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। একদিন নতুন এক পরিবার এসে উঠল সে বাড়িতে। তাদের যত্নে টিয়া পাখিটি প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু কিছুদিন পর এ পরিবারটিকেও বাড়ি ছাড়তে হল। আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ল টিয়া পাখির জীবন।

ক. বাড়ি ছাড়ার মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে কতদিন হয়েছিল?

খ. 'হিন্দুয়ানির চিহ্ন' বলতে গল্পে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদের ঘটনা অনুসরণে গল্পের আশ্রিত মানুষদের বাড়ি ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুমূর্ষু টিয়া পাখি, বিবর্ণ তুলসী গাছ এবং মানুষের অস্থির জীবন যেন একই সূত্রে গাঁথা'- মন্তব্যটি একটি তুলসী গাছের কাহিনী' এর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

একুশের গল্প

জহির রায়হান

লেখক পরিচিতি

জীবনমুখী সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও চলচ্চিত্রকার। তিনি জহির রায়হান হিসেবে সুপরিচিত হলেও তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিএ (অনার্স) পাস করেন। একজন ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে তখন থেকেই তিনি পরিচিত। পরবর্তীতে চলচ্চিত্র পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের উপর তলার মানুষ থেকে শুরু করে গাঁয়ের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে পর্যন্ত ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। উপন্যাস, 'হাজার বছর ধরে', 'আরেক ফাল্গুন', 'বরফ গলা নদী', 'আর কত দিন' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। 'জীবন থেকে নেয়া', স্টেপ জেনোসাইড', ' লেট দেয়ার বি লাইট' ইত্যাদি। এসব স্মরণীয় চলচ্চিত্র আমাদের জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে সর্বাধিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

প্রখ্যাত সাংবাধিক ও ঔপন্যাসিক শহীদুল্লাহ কায়সার তাঁর অগ্রজ। এ দেশের স্বাধীনতা লাভের পর অপহৃত শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে জহির রায়হান আর ঘরে ফেরেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ ও শহীদ হন।

তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবি নি কোনদিন। তবু সে আবার ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে। ভাবতে অবাক লাগে, চার বছর আগে যাকে হাইকোর্টের মোড়ে শেষবারের মতো দেখেছিলাম, যাকে জীবনে আর দেখবো বলে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি- সেই তপু ফিরে এসেছে। ও ফিরে আসার পর থেকে আমরা সবাই যেন কেমন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। রাতে ভালো ঘুম হয় না। যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে। ভয়ে জড়সড় হয়ে যাই। লেপের নিচে দেহটা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপে।

দিনের বেলা ওকে ঘিরে আমরা ছোটখাটো জটলা পাকাই। খবর পেয়ে অনেকেই দেখতে আসে ওকে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা। আমরা যে অবাক হই না তা নয়। আমাদের চোখেও বিস্ময় জাগে। দু'বছর ও আমাদের সাথে ছিল। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের খবরও আমরা রাখতাম। সত্যি কি অবাক কান্ড দেখ তো, কে বলবে যে এ তপু। ওকে চেনাই যায় না। ওর মাকে ডাকো, আমি হলপ করে বলতে পারি, ওর মা-ও চিনতে পারবে না ওকে।

চিনবে কী করে? জটলার একপাশ থেকে রাহাত নিজের মত বলে চেনার কোনো উপায় থাকলে তো চিনবে। এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

আমরাও কেমন যেন অনমনা হয়ে পড়ি ক্ষণেকের জন্য। অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করে কাল সকালে রাহাতকে পাঠিয়েছিলাম, তপুর মা আর বউকে খবর দেবার জন্য।

সারাদিন এখানে সেখানে পইপই করে ঘুরে বিকেলে যখন রাহাত ফিরে এসে খবর দিলো, ওদের কাউকে পাওয়া যায় নি তখন রীতিমতো ভাবনায় পড়লাম। এখন কী করা যায় বল তো, ওদের এক জনকেও পাওয়া গেল না? আমি চোখ তুলে তাকালাম রাহাতের দিকে।

বিছানার ওপর ধপাস করে বসে রাহাত বললো, ওর মা মারা গেছে।

মার গেছে? আহা সেবার এখানে গড়াগড়ি দিয়ে কী কান্নাকাটিই না তপুর জন্যে কেঁদেছিলেন তিনি। ওঁর কান্না দেখে আমার নিজের চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

বউটার খবর?

ওর কথা বলো না আর। রাহাত মুখ বাঁকালো। অন্য আর এক জায়গায় বিয়ে করেছে। সেকি। এর মধ্যে বিয়ে করে ফেললো মেয়েটা? তপু ওকে কত ভালাবসতো। নাজিম বিড়বিড় করে বলে উঠলো চাপা স্বরে। সানু বললো, বিয়ে করবে না তো কি সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকবে নাকি মেয়েটা। বলে তপুর দিকে তাকালো সানু। আমরাও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম ওর ওপর।

সত্যি, কে বলবে এ চার বছর আগেকার সেই তপু, যার মুখে এক ঝলক হাসি আঠার মতো লেগে থাকতো সব সময়, তার দিকে তাকাতে ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে আসে কেন?

দু'বছর সে আমাদের সাথে ছিলো।

আমরা ছিলাম তিনজন।

আমি, তপু আর রাহাত।

তপু ছিলো আমাদের মাঝে সবার চাইতে বয়সে ছোট। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কী হবে, ও-ই ছিলো একমাত্র বিবাহিত।

কলেজে ভর্তি হবার বছরখানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে তপু। সম্পর্কে মেয়েটা আত্মীয়া হতো ওর। দোহারা গড়ন, ছিপছিপে কটি, আপেল রঙের মেয়েটা। প্রায়ই ওর সাথে দেখা করতে আসতো এখানে। ও এলে আমরা চাঁদা তুলে চা আর মিষ্টি এনে খেতাম। আর গল্পগুজবে মেতে উঠতাম রীতিমতো। তপু ছিল গল্পের রাজা। যেমন হাসতে পারতো ছেলেটা, তেমনি গল্প করার ব্যাপারেও ছিল ওস্তাদ।

যখন ও গল্প করতে শুরু করতো, তখন কাউকে কথা বলার সুযোগ দিতো না। সেই যে লোকটার কথা তোমাদের বলেছিলাম না সেদিন। সেই হোঁৎকা মোটা লোকটা, ক্যাপিটালে যার সাথে আলাপ হয়েছিল, ওই যে, লোকটা বলছিল সে বার্নাড'শ হবে, পরশু রাতে মারা গেছে একটা ছ্যাকড়া গাড়ির তলায় পড়ে। ..... আর সেই মেয়েটা, যে ওকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলো ...ও মারা যাবার পরের দিন এক বিলেতি সাহেবের সাথে পালিয়ে গেছে .... রঙ্গী মেয়েটার খবর জানতো। সে কী, রঙ্গীকে চিনতে পারছো না? শহরের সেরা নাচিয়ে ছিলো, আজকাল অবশ্য রাজনীতি করছে। সেদিন দেখা হল রাস্তায়। আগে তো পাটকাঠি ছিলো। এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে। দেখা হতেই রেস্তোঁরায় নিয়ে খাওয়ালো। বিয়ে করেছি শুনে জিজ্ঞেস করলো, বউ দেখতে কেমন।

হয়েছে, এবার তুমি এসো। উঃ, কথা বলতে শুরু করলে যেন আর ফুরোতে চায় না। রাহাত থামিয়ে দিতে চেষ্টা করতো ওকে।

রেণু বলতো, আর বলবেন না, এত বক্‌তে পারে .....।

বলে বিরক্তিতে না লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো সে।

তবু থামতো না তপু। এক গাল হাসি ছড়িয়ে আবার পরস্পরাহীন কথার তুবড়ি ছোটাত সে, থাকগে অন্যের কথা যখন তোমরা শুনতে চাও না নিজের কথাই বলি। ভাবছি, ডাক্তারিটা পাশ করতে পারলে এ শহরে আর থাকবো না, গাঁয়ে চলে যাবো। ছোট্ট একটা ঘর বাঁধবো সেখানে। আর, তোমরা দেখো, আমার ঘরে কোন জাঁমজমক থাকবে না। একেবারে সাধারণ, হাঁ, একটা ছোট্ট ডিসপেনসারি আর কিছু না। মাঝে মাঝে এমনি স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ড়ছিল তপু।

এককালে মিলিটারিতে যাবার সখ ছিল ওর।

কিন্তু বরাত মন্দ। ছিলো জন্মতখোঁড়া। ডান পা থেকে বাঁ পাটা ইঞ্চি দুয়েক ছোট ছিল ওর। তবে বাঁ জুতোর হিলটা একটু উঁচু করে তৈরি করায় দুর থেকে ওর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাটা চোখে পড়তো না সবার। আমাদের জীবনটা ছিলো যান্ত্রিক।

কাক-ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতাম আমরা। তপু উঠতো সবার আগে। ও জাগাতো আমাদের দুজনকে, ওঠো, ভোর হয়ে গেছে দেখছো না? অমন মোষের মতো ঘুমোচ্ছো কেন, ওঠো। গায়ের উপর থেকে লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে জোর করে আমাদের ঘুম ভাঙাতো তপু। মাথার- কাছে জানালাটা খুলে দিয়ে বলতো, দেখ বাইরে কেমন মিষ্টি রোদ উঠেছে। আর ঘুমিয়ো না, ওঠো।

আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে, নিজ হাতে চা তৈরি করতো তপু। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুকুম দিয়ে আমরা বই খুলে বসতাম। তারপর দশটা লাগাদ স্নানাহার সেরে ক্লাশে যেতাম আমরা।

বিকেলটা কাটতো বেশ আমোদ-ফুর্তিতে। কোনদিন ইস্কাটনে বেড়াতে যেতাম আমরা। কোনদিন বুড়িগঙ্গার ওপারে। আর যেদিন রেণু আমাদের সাথে থাকতো, সেদিন আজিমপুরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দত্তর গাঁয়ের ভেতর হারিয়ে যেতাম আমরা।

রেণু মাঝে মাথে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে। গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড়মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা। অপু বলতো, দেখো, রাহাত, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান?

কী?

এই যে আঁকাবাঁকা লালমাটির পথ, এ পথের যদি শেষ না হতো কোনদিন। অনন্ড়কাল ধরে যদি এমনি চলতে পারতাম আমরা।

একি, তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে? ভ্রূ জোড়া কুঁচকে হঠাৎ প্রশ্ন করতো রাহাত।

না, না, কবি হতে যাব কেন। ইতস্ড় করে বলতো তপু। তবু কেন যেন মনে হয়.....।

স্বপ্নালু চোখে স্বপ্ন নাবতো তার।

আমরা ছিলাম তিনজন।

আমি, তপু আর রাহাত।

দিনগুলো বেশ কাটছিলো আমাদের। কিন্তু অকস্মাৎ ছেদ পড়লো। হোস্টেলের বাইরে, সবুজ ছড়ানো মাঠটাতে অগুণিত লোকের ভীড় জমেছিলো সেদিন। ভোর হতে ক্রুদ্ধ ছেলেবুড়োরা এসে জমায়েত হয়েছিলো সেখানে। কারো হাতে প্যাকার্ড, কারো হাতে স্লোগান দেবার চুঙ্গো, আবার কারো হাতে লম্বা লাঠিটায় ঝোলানো কয়েকটা

রক্তাক্ত জামা। তর্জনী দিয়ে ওরা জামাগুলো দেখাচ্ছিল, আর শুকনো, ঠোঁট নেড়ে এলোমেলো কী যেন বলছিলো নিজেদের মধ্যে। তপু হাত ধরে টান দিলো আমায়, এসো।

কোথায়?

কেন, ওদের সাথে।

চেয়ে দেখি, সমুদ্রগভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

এসো।

চলো।

আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম।

একটু পরে পেছন ফিরে দেখি, রেণু হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। যা ভেবেছিলাম, দৌড়ে এসে তপুর হাত চেপে ধরলো রেণু। কোথায় যাচ্ছ তুমি। বাড়ি চলো। পাগল নাকি, তপু হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। তারপর বললো, তুমিও চলো না আমাদের সাথে। না, আমি যাবো না, বাড়ি চলো। রেণু আবার হাত ধরলো ওর। কী বাজে বকছেন। রাহাত রেগে উঠলো এবার। বাড়ি যেতে হয় আপনি যান। ও যাবে না।

মুখটা ঘুরিয়ে রাহাতের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এক পলক তাকালো রেণু। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, দোহাই তোমার বাড়ি চলো। মা কাঁদছেন।

বললাম তো যেতে পারবো না, যাও। হাতটা আবার ছাড়িয়ে নিলো তপু।

রেণুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো। বললাম, কী ব্যাপার আপনি এমন করছেন কেন, ভয়ের কিছু নেই, আপনি বাড়ি যান।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে টলটলে চোখ নিয়ে ফিরে গেলো রেণু। মিছিলটা তখন মেডিকেলের গেট পেরিয়ে কার্জন হলের কাছাকাছি এসে গেছে।

তিনজন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম।

রাহাত স্লোগান দিচ্ছিলো।

আর অপুর হাতে ছিলো একটি মস্তবড় প্ল্যাকার্ড। তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগলো চারপাশে। ব্যাপার কী বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।

তপু রাহাত আর্তনাদ করে উঠলো।

আমি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

দুজন মিলিটারি ছুটে এসে তপুর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেলো আমাদের সামনে থেকে। আমরা একটুকুও নড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না। দেহটা যেন বরফের মতো জমে গিয়েছিলো, তারপর আমিও ফিরে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠলাম, রাহাত পালাও।

কোথায় হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো রাহাত।

তারপর উভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলাম আমরা ইউনিভার্সিটির দিকে। সে রাতে তপুর মা এসে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলাম এখানে। রেণুও এসেছিলো, পলকহীন চোখজোড়া দিয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছিলো তার। কিন্তু আমাদের দিকে একবারও তাকায় নি সে। একটা কথাও আমাদের সাথে বলেনি রেণু। রাহাত শুধু আমার কানে ফিসফিস করে বলেছিলো, তপু না মরে আমি মরলেই ভালো হতো। কী অবাক কাণ্ড দেখ তো, পাশাপাশি ছিলাম আমরা। অথচ আমাদের কিছু হলো না, গুলি লাগলো কিনা তপুর কপালে কী অবাক কাণ্ড দেখ তো।

তারপর চারটে বছর কেটে গেছে। চার বছর তপুকে ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবি নি কোনদিন।

তপু মারা যাবার পর রেণু এসে একদিন মালপত্রগুলো সব নিয়ে গেলো ওর। দুটো স্যুটকেস, একটা বইয়ের ট্রাঙ্ক, আর একটা বেডিং। সেদিনও মুখ ভার করে ছিলো রেণু।

কথা বলেনি আমাদের সাথে। শুধু রাহাতের দিকে একফলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, ওর একটা গরম কোট ছিলো না, কোটটা কোথায়? ও, ওটা আমার স্যুটকেসে। ধীরে কোটটা বের করে দিয়েছিলো রাহাত।

এরপর দিন কয়েক তপুর সিটটা খালি পড়ে ছিলো। মাঝে মাঝে রাত শেষ হয়ে এলে আমাদের মনে হতো, কে যেন গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে আমাদের।

ওঠো, আর ঘুমিও না, ওঠো।

চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেতাম না, শুধু ওর শূন্য বিছানার দিকে তাকিয়ে মনটা ব্যথায় ভরে উঠতো।

তারপর একদিন তপুর সিটে নতুন ছেলে এলো একটা। সে ছেলেটা বছর তিনেক ছিলো।

তারপর এলো আর একজন। আমাদের নতুন রুমমেট। বেশ হাসিখুশি ভরা মুখ।

সেদিন সকালে বিছানায় বসে, 'এনাটমি'র পাতা উল্টাচ্ছিলো সে। তার চৌকির নিচে একটা ঝুড়িতে রাখা 'স্কেলিটনের' 'স্কাল'টা বের করে দেখছিলো আর বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়ছিলো সে। তারপর এক সময় হঠাৎ রাহাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, রাহাত সাহেব, একটু দেখুন তো, আমার স্কালের কপালের মাঝখানটায় একটা গর্ত কেন? কী বললে? চমকে উঠে উভয়েই তাকালাম ওর দিকে।

রাহাত উঠে গিয়ে স্কালটা তুলে নিলো হাতে। ঝুঁকে পড়ে সে দেখতে লাগলো অবাক হয়ে। হাঁ, কপালের মাঝখানটায় গোল একটা ফুটো, রাহাত তাকালো আমার দিকে, ওর চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হলো না আমার। বিড়বিড় করে বললাম, বাঁ পায়ের হাড়টা দু'ইঞ্চি ছোট ছিলো ওর।

কথাটা শেষ না হতেই ঝুড়ি থেকে হাড়গুলো তুলে নিলো রাহাত। হাতগুলো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলো ওর। একটু পরে উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে বললো, বাঁ পায়ের টিবিয়া ফেবুলাটা দু'ইঞ্চি ছোট।

দেখো, দেখো।

উত্তেজনায় আমিও কাঁপছিলাম।

ক্ষণকাল পরে স্কালটা দুহাতে তুলে ধরে রাহাত বললো, তপু।

বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো ওর।

শব্দার্থ ও টীকা

দোহারা	-	মোটাও নয় রোগাও নয়।
কটি	-	কোমর।
বার্নার্ড শ	-	জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)। ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক ও নাট্যকার। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান', 'সেন্ট জোয়ান' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত নাটক।
ছ্যাকড়া গাড়ি	-	নিকৃষ্টমানের ঘোড়ার গাড়ি। ছক্কড় মার্কা গাড়ি।
পরম্পরাহীন	-	ধারাবাহিকতাবিহীন।
তুবড়ি	-	অনেক ওপরে পর্যন্ড়আগুনের ফুলকির ফোয়ারা ওঠে এমন এক ধরনের বাজি।
কথার তুবড়ি	-	অনর্গল কথা।
ডিসপেনসারি	-	ঔষধের দোকান।
সমুদ্র-গভীর জনতা	-	উত্তাল জনতার সমুদ্র।
প্ল্যাকার্ড	-	প্রকাশ্যে প্রদর্শনের জন্য প্রাচীর পত্র বা পোস্টার।
এনাটমি	-	শরীরবিদ্যা, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, Anatomy।
স্কেলিটন	-	কঙ্কাল Skeleton ।
স্কাল	-	মাথার খুলি Skull ।
টিবিয়া ফেবুলা	-	জঙ্গাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি, Tibia-fibula।

উৎস ও পরিচিতি

জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' সংগ্রহ করা হয়েছে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত জহির রায়হান রচনাবলির দ্বিতীয় খন্ডথেকে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পে লেখক এঁকেছেন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত এক প্রাণবন্ড় উদ্দাম, হৃদয়বান সহপাঠীর ছবি যে শহীদ হয় ভাষা আন্দোলনে। লাশ ছিনতাই হয়ে যায় মিলিটারির হাতে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে নর-কঙ্কালের সঙ্গে মিলিয়ে শরীরবিদ্যা পড়ার সময়ে আবিস্কৃত হয় এ কঙ্কাল সেই শহীদ সহপাঠীর।

অনুশীলনমূলক কাজ

সাহিত্যবোধ □ বাস্তব সত্য ও শিল্পসত্য

লেখক সত্যি বা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে যে সাহিত্য তৈরি করেন তাকে কিন্তু সব সময় পুরোপুরি ইতিহাস বা সত্য ঘটনা বলা চলে না। কারণ লেখক এখানে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নতুনভাবে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদি সৃষ্টি করে থাকেন।

লেখক সাহিত্যের যে চরিত্র সৃষ্টি করেন তার বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াকলাপ যতটা গল্পের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে, বাস্তবের সঙ্গে ততটা নয়।

তবে সাহিত্যের সত্য হুবহু সত্য না হলেও লেখক সাহিত্যে এক ধরনের সত্যকে তুলে ধরেন। তাকে বলা হয়, শিল্প-সত্য বা কাব্য-সত্য। সব মহৎ সাহিত্য ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে এই ধরনের শিল্প-সত্য। খুঁটিয়ে দেখলে যে কোনো সার্থক সাহিত্যকর্মে আমরা দু'ধরনের অর্থের দেখা পাই। একটি হচ্ছে আক্ষরিক অর্থ, অন্যটি প্রতীকী তাৎপর্য। আক্ষরিক অর্থ আমাদের আক্ষরিক সত্যের ধারণা দেয় এবং প্রতীকী তাৎপর্য দেয় প্রতীকী সত্যের মহিমা, যা শিল্প- সত্যেরই নামান্তর। লেখক আক্ষরিক সত্যকে ব্যবহার করেন শিল্প-সত্যের মহিমা ফুটিয়ে তুলতে। আক্ষরিক সত্য স্থানীয়, কালিম সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু শিল্পসত্য স্থান ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বজনীন হয়ে যায়।

'একুশের গল্পে' বর্ণিত তপু চরিত্রটি এই গল্পে চরিত্র হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় নয়। আর চরিত্র ফুটে উঠেছে বর্ণনাকারীর বিবরণের মাধ্যমে। কিন্তু সেই বর্ণনার মধ্যেও ঐ চরিত্রের একটা ছবি বা ভাবমূর্তি আমাদের মনের মধ্যে তৈরি হয় আমাদের মনের ছবিতে আমরা তাকে সক্রিয় হতে দেখি দৈনন্দিন জীবনে, মিছিলে, আন্দোলনে। দেখি, গুলি খেয়ে তাকে রাজপথে লুটিয়ে পড়তে। দেখি পুলিশের হাতে তার লাশ ছিনতাই হতে। এমনকি গল্পের শেষে যখন দেখা যায়, মেডিকেলের ছাত্রের হাতে মাথার খুলির মাঝখানে গর্ত এবং পায়ের হাড় দু'ইঞ্চি ছোট তখনও আমাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে ভাষা আন্দোলনের নিহত মৃত তপুর ছবি।

লেখক আমাদের মনের পর্দায় যে তপুর ছবি করে দেন সে তপু বাস্তবের কোনো তপু নয়, কিন্তু এই তপুর মধ্যে দিয়ে ভাষা আন্দোলনের নাম না-জানা শহীদের প্রতীক ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। এভাবে প্রতীকী তাৎপর্যের মাধ্যমে লেখক আমাদের সামনে শিল্প-সত্য তুলে ধরেন।

দ্বিতীয়ত কল্পিত এই চরিত্র ভাষা আন্দোলনের স্থানিক ও কালিক মহিমা অতিক্রম করে যায়ই গল্প দেশে কিংবা দেশের বাইরে যেখানেই কিংবা যতদিন পরেই পঠিত হোক না কেন পাঠকের মনের পর্দায় তপু জীবন্ত হয়ে ওঠে ভাষার জন্যে আত্মদান করেছে এমন একটি সর্বজনীন চরিত্রের প্রতীক হিসেবে।

বাস্তবের সত্য থেকে শিল্প-সত্য যে আলাদা সেটা আরও বোঝা যায় এভাবে দেখলে: ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ঘটনার যে বিবরণ আমরা পড়ি তা বাস্তব সত্যই কিন্তু তাতে তপুর মতো কোনো চরিত্র আমাদের মনে ফুটে ওঠে না। কিন্তু গল্পের তপু আমাদের মনের পর্দায় জীবন্ত হয়ে বাস্তব সত্যকেও ছাড়িয়ে যায়।

ভাষা অনুশীলন ❑ অনুসর্গ

বাক্যের কোনো কোনো শব্দ পদের পরে বসে ঐ পদের বিভক্তির কাজ করে-এদের বলা হয় অনুসর্গ। এগুলোকে বিভক্তি হিসেবে ব্যবহৃত পদ বলা চলে। যেমন:

তপুর আবার ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে।
অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা।
হাসি দিয়ে ঘরটাকে ভরিয়ে রাখতো সে।
বছরখানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে তপু।
ক্যাপিটালে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।
ভোর হতে ছেলেবুড়ো এসে জমায়েত হল।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তপুর প্রিয় বিষয় কী ছিল?

ক. বই পড়া   খ. গল্প বলা

গ. কঙ্কাল দেখা   ঘ. মিছিল করা

২. 'ওর মাও চিনতে পারবে না ওকে।' কারণ-

ক. অসুখে তপু কঙ্কালসার হয়ে গেছে।

খ. ঘটনাক্রমে তপুর কঙ্কাল ফিরে এসেছে।

গ. অত্যাচার করে পুলিশ ফিরিয়ে দিয়েছে তপুকে।

ঘ. দীর্ঘ সময় অভুক্ত থেকে নিরুদ্দেশ তপু ফিরে এসেছে।

৩. 'রাঙা ঠোঁটের উপর যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তপাঁর বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না; উদ্ধৃতির অংশটুকু একুশের গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত?

ক. রাহাতের   খ. তপুর

গ. রেণুর   ঘ. লেখকের

৪. কোন জীবনের প্রতি তপুর অফুরন্তআগ্রহ ছিল?

i. সুশৃঙ্খল সামরিক জীবনের প্রতি

ii. অর্থ-ঐশ্বর্যে কেতাদুরস্তজীবনের প্রতি

iii. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর নির্জন জীবনের প্রতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii   ঘ. iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের শহীদ নূর হোসেনের

পিছনে লেখা : স্বৈরাচার নিপাত যাক

গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

৫. নূর হোসেনের সঙ্গে একুশের গল্পের কোন চরিত্রের মিল লক্ষ করা যায়?

ক. রেণুর   খ. রাহাতের

গ. লেখকের   ঘ. তপুর

৬. নূর হোসেনের সঙ্গে তপুর ঐক্যের বিষয় কোনটি?

ক. পিছনে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লেখা নিয়ে পুলিশের গুলিতে আত্মহুতি

খ. 'জয় বাংলা' বলে শোগান দিতে দিতে মিলিটারির গুলিতে মৃত্যু বরণ

গ. 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে পুলিশের গুলিতে আত্মহুতি

ঘ. স্বৈরাচার বিরোধী মিছিলে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আত্মহুতি।

http://zoaddar.org

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ:

মায়ের একমাত্র ছেলে সোহেব। মেধায়, সংস্কৃতিমনস্কতায়, রাজনীতি সচেতনতায় তিনি ছিলেন আলোকিত মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তার এই প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। বিধবা মা আশায় বুক বাঁধেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে তিনি শহীদ হন। মায়ের আশা ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়। পুত্র হারানোর শোকে মা সর্বস্বান্ড়বোধ করেন। কিন্তু মায়ের মনোজগতে তৈরি হয় হারানো পুত্রের এক কল্পচিত্র। যাপিত জীবনের সকল কাজে-কর্মে, ভাব-ভাবনায় তিনি তার পুত্রকে দেখতে পান। আর এই বিভ্রমের মধ্যেই তার জীবন-যাপন।

ক. তপুর হাতের প্যাকার্ডে কী লেখা ছিল?

খ. 'ওকে চেনাই যায় না'- কেন চেনা যায় না-ব্যাখ্যা কর।

গ. তপুকে ফিরে পেয়ে বন্ধুদের মধ্যে যে উপলব্ধি তৈরি হয় তার সঙ্গে উদ্দীপকের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'একুশের গল্পে'র অংশ বিশেষের যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায় তার স্বরূপ-প্রকৃতি বিশেষণ কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ:

প্রিয় পান্না,

আমাকে তুমি বারণ করেছিলে। বলেছিলে 'সন্ড়ানের মুখের দিকে চেয়ে আমার কথা শোন-যেয়ো না।' আমি দেখলাম, তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা সত্যি অসম্ভব। তাই পালিয়ে আসতে হল। স্বাধীনতার ডাক আমার প্রাণের মধ্যে বাজছিল। সেই ডাকে সাড়া না-দিয়ে আমি যদি তোমাকে নিয়ে, বিনুকে নিয়ে সময় কাটাতাম তা হলে শান্ড়িপতাম না; সারাক্ষণ অপরাধী হয়ে থাকতাম। তোমার অমানবিক কষ্ট আর লাঞ্ছনার কথা আমি জানি। আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করো।

ইতি

তোমার শিশির

ক. তপুর স্ত্রীর নাম কী?

খ. অনন্ড়কাল ধরে তপু কেমন পথে চলতে চেয়েছিল-ব্যাখ্যা কর?

গ. তপুর স্ত্রী তপুকে মিছিলে যেতে নিষেধ করেছিল। অনুচ্ছেদের সঙ্গে সেই নিষেধের সম্পর্ক-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'একুশের গল্প' শীর্ষক গল্পের অংশ বিশেষের বক্তব্যগত যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তার স্বরূপ-প্রকৃতি বিশেষণ কর।

দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ

গণতন্ত্র ও সুশাসন একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল নারী ও পুরষের সমান সযোগ প্রদান, তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জনগণের প্রয়োজনে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্রত সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতাই হল সুশাসনের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র জনগণের পক্ষে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে। এ লক্ষ্যে জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত করে। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এই প্রশাসন জনগণের দেওয়া করের বিপরীতে নৈতিকতা ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রীয় কাজে সহায়তার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এদের আন্তরিক উপস্থিতি, সুস্থ ও সৎ চর্চার ওপর নির্ভর করে কোনো একটি দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন। সুতরাং গণতন্ত্র ও সুশাসন পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হলেই দেশের সকল নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য দূরীভূত হবে। দুর্নীতি এই সামগ্রিম সুষ্ঠু পরিস্থিতির পরিপন্থী।

দুর্নীতি কী

প্রকৃতি গণতন্ত্রও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। দুর্নীতি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিকর সামাজিক ব্যাধিগুলোর অন্যতম। দুর্নীতি শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ 'ধ্বংস ক্ষতি সাধন'। জাতিসংঘ প্রণীত ম্যানুয়াল অন অ্যান্টি-করাপষণ পলিসি (manual on anti-corruption pilici) অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করাই হল দুর্নীতি। এই ক্ষতার অপব্যবহার সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ধারা ২ (৩) অনুযায়ী দুর্নীতি বলতে 'ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ প্রদান, সরকারি কর্মচারীকে অপরোধে সহায়তা করা, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্যবান বস্তু বিনামূল্যে গ্রহণ, কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক বেআইনিভাবে কোনো ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত হওয়া, কোনো শাস্তি বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য, অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত, অসাধু উদ্দেশ্যে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ, নথি জাল করা, খাঁটি দলিলকে জাল হিসেবে ব্যবহারকরণ, হিসাব বিকৃতকরণমূলক কর্মকান্ড এবং দুর্নীতিতে সহায়তা প্রদান'- কে বোঝায়।

দুর্নীতি কেন হয়

দুর্নীতি সংঘটনে বেশ কিছু কারণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিগত কারণের পাশাপাশি পদ্ধতিগত কিছু কারণ দুর্নীতির বিস্তার ঘটাতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে দুর্নীতির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন:

আইনগত ও প্রশাসনিক কারণ-

১. জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতা: গণতন্ত্র ও জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন: জাতীয় সংসদ, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ইত্যাদির অন্যতম প্রধান ভূমিকা হচ্ছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত না হলে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

২. রাজনৈতিক প্রভাব: বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রশাসন ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দুর্নীতিগ্রস্ড় এবং জনপ্রশাসনে এর যথেচ্ছ প্রভাবে থাকার কারণে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়।

৩. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব: সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্ড়রে দুর্নীতি বিস্ড়ারের একটি কারণ হল প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব। বাংলাদেশের প্রশাসন ঔপরিবেশিক আমলের প্রশাসনিক কাঠামোরই উত্তরাধিকার, যেখানে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া অনুপস্থিত।

৪. দায়িত্বে অবহেলা: নির্দিষ্ট দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে অবহেলাও দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

৫. তথ্যে অধিকারে অভাব: বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ড়এবং রাষ্ট্রীয় তথ্যে সাধারণ জনগণের অধিকার না থাকার কারণে দুর্নীতি করার সুযোগ বেড়ে যায়।

আর্থ-সামাজিক কারণ-

১. ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়: বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে ভোগবাদী প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে মানুষের লোভ-লালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে মানুষ বৃহৎ স্বার্থের কথা ভুলে যায় দুর্নীতি বিস্ড়ৃত হচ্ছে।

২. আয়-ব্যায়ের অসামঞ্জস্যতা: দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে তাদের স্বাভাবিক আয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এটিকে অনেকে দুর্নীতির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। তবে এটাও সত্যি, গুটিকতক দুর্নীতিগ্রস্ড়ব্যক্তি ছাড়া বেশিরভাগ মানুষই তাদের বিভিন্ন চাহিদা উপেক্ষা করে সৎভাবে জীবন-যাপন করে থাকেন।

দুর্নীতির প্রভাব

রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নিজের স্বার্থে ব্যবহার, সরকারি ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ বা কমিশনের বিনিময়ে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে অর্থ উপার্জন, বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ ব্যবহার না করে আত্মসাৎ, বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন পাসপোর্ট, পুলিশ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও অন্যান্য খাতে ঘুষের লেনদেন, অতিরিক্ত মুনাফা আদায়, সরকারি বরাদ্ধ ও অনুদানের অর্থ ও দ্রব্য আত্মসাৎ, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণে ভেজাল দ্রব্য মেশানো এবং বিভিন্ন সরকারি কাজে দালালদের দৌরাত্মসহ সর্বক্ষেত্রেহ দুর্নীতির ব্যাপক বিস্ড়ার ঘটেছে।

১. অর্থনৈতিক প্রভাব

দুর্নীতির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে, উন্নয়ন ব্যহৃত হয় রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়। কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিগত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সেবা খাতে দুর্নীতির দরুণ বছরে প্রায় ৮-১০ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দুর্নীতির ফলে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের আয় আরো কমে যায়, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। ফলে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ন্যায়বিচার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। একটি জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের ৯টি খাতে ২৫টি সেবা নিতে প্রায় ৭৪ শতাংশ ঘুষ প্রদান করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতে বাংলাদেশের অবৈধ আয়ের পরিমাণেই মোট জাতীয় শতকরা ৩০-৩৪ ভাগ।

২. রাজনৈতিক প্রভাব

দুর্নীতির কারণে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতি দেশে সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং নীতি-নির্ধারণ পদ্ধতিতে জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয় না, ফলে সরকার ও রাষ্ট্রের ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয় এবং জাতি ক্রমান্বয়ে দিক-নির্দেশনাহীন ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে।

৩. সামাজিক প্রভাব

দুর্নীতির ফলে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাবান শ্রেণীর মানুষেরা দুর্নীতির কারণে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে এবং অন্যদিকে দরিদ্র-শ্রেণীর মানুষের আয় না বাড়ার ফলে ধনী-দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য বেড়ে যায়। দুর্নীতির অবাধ বিস্তার মানব উন্নয়নবাধাগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারে মতো মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। দেশের সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে নারী, শিশু ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ন্যায় যারা সমাজে সুবিধা-বঞ্চিত তারাই দুর্নীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

দুর্নীতি কিভাবে রোধ করা যায়

বিশ্বের সব দেশেই কম-বেশী দুর্নীতি আছে। দুর্নীতিকে সমাজ থেকে পুরোপুরি নির্মুল করা না গেলেও সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রের একার পক্ষে রোধ করা সম্ভব নয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব। দুর্নীতি রোধ করতে নিচের কার্যক্রমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. রাজনৈতিক সদিচ্ছ

দুর্নীতি রোগের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং রাজনৈতিক মূল্যবোধ থেকে তারা যারা সৎ ও আন্তরিক হয় তাহলে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব। দুর্নীতি প্রতিরোধ সদিচ্ছা প্রমাণ করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে (ক) দুর্নীতিবাজদের সদস্যপদ না দেওয়া, (খ) অব্যাহত গণতান্ত্রিক চর্চা, (গ) প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।, (ঘ) সংগঠনের ভেতর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, (ঙ) সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান এবং (চ) অসৎ উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ না করা নিশ্চিত করতে হবে।

২। কার্যকর সংসদ:

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন কার্যকর সংসদ। সংসদীয় পদ্ধতিতে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্যেও গতিশীল সংসদের প্রয়োজন। সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব, মনোযোগ আকর্ষণ, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে বক্তব্য প্রদান, শক্তিশালী কমিটি ব্যবস্থার বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। এসব উপায় অবলম্বন করে প্রশাসনের জবাদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। বিশেষ করে সংসদের সরকারি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩। স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। এর জন্য প্রয়োজন স্বাধীন বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগকে প্রশাসন ও সংসদের প্রভাব মুক্ত হতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়-সমাজে তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে আইনের যথাযথ প্রয়োগের ফলে মানুষ দুর্নীতি পরিহার করছে।

৪। সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশনের যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তকরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রেখে দুর্নীতি রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করাই কমিশনের অন্যতম কাজ। সরকার এই কমিশনকে নিঃশর্তভাবে আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক সহায়তা দেবে। দুর্নীতিবিরোধী হটলাইন রাজধানী থেকে থানা পর্যায় প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং কমিশনের মাঝে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, দ্রুত বিশেষ টিমের সমন্বয়ে সকল সরকারি সংস্থার আয়-ব্যয়ের পুরো তদন্ড় সম্পাদন, তদন্ড়কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে পর্যাপ্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ও কর্মীদের জবাদিহিতা এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কারের বিধান রাখতে হবে।

৫। সুষম বেতন কাঠামো ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ:

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয় করে সুষম বেতন কাঠামো এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৬। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা:

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির ফলে ক্ষতির শিকার হয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সংগঠনগুলো যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হয় তাহলে দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

৭। গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা

দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজে দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য অনুসন্ধান এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে গণমাধ্যম দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ

দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যাতে ঘুষ ও দুর্নীতিতে জড়িত হতে না পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ আইনটি করা হয়। ১৯৫৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির আয় ও ব্যয়ের অসঙ্গতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ২০০৩ সালের গৃহীত দুর্নীতি আইনের ওপর ভিত্তি করে ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৭ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন সুসংগঠন ও বিধিমালা প্রণয়নসহ ব্যাপক সংস্কারের ফলে কমিশনের লক্ষ্যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

দুর্নীতির আন্তর্জাতিক প্রভাব উপলব্ধি করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন ঘুষ ও দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ ঘোষণা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির বিস্তার রোধের লক্ষ্যে ২০০৩ সালের ৩১ শে অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দুর্নীতিবিরোধী সনদ প্রণয়ন করে, যা ২০০৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর মেক্সিকোর মেরিডাতে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ কারণে ৯ই ডিসেম্বরকে 'আন্ড়

জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সনদে প্রায় ১৫০টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। সরকার কর্তৃক এ সনদে অনুস্বাক্ষরের ফলে ২০০৭ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ এই গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ সনদের অংশীদার দেশ (State party) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। তাই দুর্নীতি প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে যুব সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা, ১১ দফা হয়ে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সকল পর্যায়েই বঞ্চিত, নিপীড়িত জাতিকে মুক্তির আলো দেখিয়েছে এ দেশের যুব সমাজ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই দেশ বিশ্বের ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এ দেশের যুব সমাজ বারবার প্রমাণ করেছে আমরা হারি নি, আমরা পেরেছি, আমরা পারবো। দেশের প্রতি তরুণদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে দুর্নীতিবিরোধী এই সামাজিক আন্দোলনকে।

শব্দার্থ ও টীকা

গণতন্ত্র - Democracy শব্দটি গ্রিক শব্দ Demos (জনগণ) এবং kartos (ক্ষমতা) থেকে উদ্ভূত। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ শাসন। আব্রাহাম লিংকনের মতে, জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের সরকারই হল গণতান্ত্রিক সরকার। সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও আইনের শাসনের অধীনে জনগণের সব ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করাই গণতন্ত্রের মূলনীতি।

দুর্নীতি - Corruption শব্দটি ল্যাটিন corruptus থেকে এসেছে যার অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতি সাধন। জাতিসংঘ প্রণীত 'ম্যানুয়াল অন অ্যান্টি করাপশন পলিসি' অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন (২০০৪) অনুযায়ী দুর্নীতি বলতে ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ প্রদান, সরকারি কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্যবান বস্তু বিনামূল্যে গ্রহণ, বে-আইনিভাবে পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শন, সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বে-আইনিভাবে কোনো ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত হওয়া, কোনো ব্যক্তির শাস্তিড়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য, অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত, অসাধু উদ্দেশ্যে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ, দুর্নীতিতে সহায়তা করা ইত্যাদি দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত।

সুশাসন - রাষ্ট্রে পরিচালনায় সর্বত্র আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নামই সুশাসন। এই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও নানা পক্ষপাত ও লাভালাভের পথ পরিহার করে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। এভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নামই সুশাসন।

তথ্যের অবাধা প্রবাহ - বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্যবিপ্লবের যুগ। এ সময়ের প্রধান সম্পদের একটি হচ্ছে তথ্য। এই তথ্যকে অবাধ, সহজপ্রাপ্য ও সর্বত্রগামী করার জন্য আন্তর্জাতিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট এবং কমিউনিকেশন সেটেলাইট বিস্ময়কর ভূমিকা রেখে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অফিস-আদালগুলো থেকে কোনো তথ্যই সহজে পাওয়া যায় না। এখানে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাও মান্ধাতার আমলের। ফলে অংশীজনেরা (Stakeholder) সহজভাবে কোনো তথ্যই পায় না। তথ্য পাওয়া না-পাওয়ার সঙ্গে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের বিষয়টিও জড়িত। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহও নিশ্চিত করতে হয়।

স্বচ্ছতা - স্বচ্ছতা (Transparency) শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ভুলতা, সন্দেহাতীতভাবে সঠিকভাবে ও সহজবোধ্যতা। রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিধি-বিধানে ও আইন-কানুনে স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন। আলোকভেদী স্বচ্ছ কাগজের মতো রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড দৃষ্টিগ্রাহ্য, বোধগম্য হওয়া বোঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহার করা যায়। এর সঙ্গে নির্ভরযোগ্য (reliability) ও যথার্থতা (Validity) জড়িত।

জবাবদিহিতা - জবাবদিহিতা বলতে বোঝায় দায়-দায়িত্বের স্বীকারোক্তি। একমাত্র একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার বিষয় থাকে না। কিন্তু একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা থাকা অপরিহার্য। জবাবদিহিতা থাকলে দুর্নীতি হ্রাস পায়। জবাবদিহিতা দক্ষতা ও সততাকে উৎসাহিত করে। জবাবদিহিতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

জনপ্রশাসন - (Public administration)রাষ্ট্রের যে প্রশাসন-ব্যবস্থা জনগণের সেবার প্রত্যক্ষভাবে কাজ করা যায় তা-ই জনপ্রশাসন। সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন ও বিধিবিধানের আওতায় জনপ্রশাসন রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে থেকে দায়দায়িত্ব পালন করে। আধিপত্য পরম্পরা (hierarchy) অনুসরণ করে যথাযথভাবে প্রজাতন্ত্রের সেবা প্রদানই জনপ্রশাসনের কাজ। অর্থাৎ নিম্নতম থেকে উচ্চতম

পর্যায় পর্যন্ড়ক্রমবিভক্ত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত জনপ্রশাসন একটি রাষ্ট্রযন্ত্রের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। সকল স্ড়রের সরকারি কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ জনপ্রশাসনের সদস্য।

মৌলিক অধিকার - কোনো রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের বাঁচার অধিকার, জীবিকার অধিকার, ধর্মের অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, চিকিৎসার লাভের অধিকার মতামত ও সংগঠনের অধিকার, নির্বাচিত করা ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তির অধিকার, বিয়ের অধিকার, আইনের অধিকার ইত্যাকার অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে। আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগটি অর্থাৎ ২৬ তম ধারা থেকে ৪৭ ক ধারা পর্যন্ড়বিধি-বিধানগুলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গিকার প্রদান করে। যেমন ২৭ ধারায় বর্ণিত হয়েছে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার।

সুশীল সমাজ - জনগণের অধিকার ও রাষ্ট্রের শুভাশুভ নিয়ে ভাবিত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকই সুশীল সমাজের সদস্য। অর্থাৎ একটি দেশের যে সচেতন ও দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে যৌক্তিক সমালোচনা করে কিংবা উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করে সেই জনগোষ্ঠীকেই বলে সুশীল সমাজ। শুধু সরকারকেই নয়-দেশের সর্বস্ড়রের কর্মকা- নিয়েই এরা কথা বলেন ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরা জাতির বিবেক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ড়রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুশীল সমাজ সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের রোষানলে পতিত হয়।

ভোগবাদ - গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩১৪-২৭০) ভোগবাদ এর (Epicurism) প্রবক্তা। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের মৌল আকাঙ্ক্ষা যেহেতু সুখ লাভ সেহেতু এ দর্শনের প্রধান কাজই হল দুঃখ পরিহারে করে মানুষ কী করে অধিক সুখের সন্ধান পেতে পারে তা দেখিয়ে দেওয়া। এপিকিউরাস বলেছিলেন সকল প্রকার সুখ ভোগ্য নয়। তাঁর মতে ব্যক্তিগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ নয়-মানসিক শান্ড়িলাভই মানব-সমাজের অন্বিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর কিছু শিষ্য দুর্নীতির মাধ্যমে পাপমূলক সুখের পথ বেছে নেয়। এপিকিউরাস এদের ত্যাগ করেন। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ ও ক্ষমতা নামক সুখ ভোগের প্রবণতা বিপুলভাবে লক্ষ করা যায়। আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়-অন্যায়বোধ পরিহার করে সামাজের কিছু ব্যক্তি দুর্নীতির মাধ্যমে ভোগবাদী জীবন বেছে নিয়েছে। এরা প্রকৃত পক্ষে সুখী মানুষ নয়-ভোগবাদী মানুষ।

সিন্ডিকেট - আভিধানিক দিক থেকে 'সিন্ডিকেট' অর্থ হলো, 'সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ-নিবন্ধন, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি সরবরাহকারী বাণিজ্যিক সমিতি; সংবাদ সমিতি।' কিন্তু বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থের নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ এখন সিন্ডিকেট বলতে বোঝায় সেই অশুভ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে যারা সমবেতভাবে কোনো পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় কিংবা দাম বাড়ানোর জন্য কোনো পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এই সব দুর্নীতির সঙ্গে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত থাকে।

প্রেক্ষাপট পরিচিতি

বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে দুর্নীতির অভিযোগে বিপুলবাবে সমালোচিত হয়ে এসেছে। বলা হচ্ছিল দুর্নীতিপরায়ণ লোক এখন আর সমাজের অসম্মানিত নয় এবং দুর্নীতিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত রার প্রবণতাও দিন দিন লোপ পাচ্ছে। দুর্নীতির জন্য শাস্তি অপ্রতুলতা ও সামাজিকভাবে নিন্দা করার প্রবণতা হ্রাস পাওয়ায় আমাদের দেশে দুর্নীতি প্রায় অলিখিত বৈধতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা নিঃসন্দেহে কারো কাম্য নয়। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতির স্বরূপচারিত্র্য উন্মোচন করা প্রয়োজন। ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দুর্নীতি কীভাবে অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে-শিক্ষার্থীদে মধ্যে সেই সচেতনতা তৈরির জন্য 'দুর্নীতি : উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি পাঠে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব তৈরি হবে এবং তারা দুর্নীতির কারণ ও প্রতিরোধের পথগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারে।

ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়িয়ে দিয়ে দুর্নীতি যে শুধু অর্থনীতিইতেই বিরূপ প্রভাব ফেলে তা নয়, অধিকন্তু সমাজের নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধ শিথিল করে দিয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করে। পরিশ্রম করে এবং মেধা ও বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে অর্থোপার্জনের মধ্যে যে সুস্থিরতা ও সুস্থতা নিহিত থাকে দুর্নীতি সেই সুস্থতার মূল্যবোধের পরিপন্থি। রাতারাতি বিত্তশালী হওয়ার ছিন্নমূল মানসিকতা থেকে যে দুর্নীতির উদ্ভব, তা কারো জন্যই মঙ্গলজনক হতে পারে না। সুতরাং সময়ের দাবি থেকেই শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন দুর্নীতি কী, দুর্নীতি কেন হয়, দুর্নীতির প্রভাব এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় ও পদ্ধতি। কেননা দুর্নীতিমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক দেশ গড়তে বর্তমান শিক্ষার্থীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ভাষা অনুশীলন ❑ উপসর্গযোগে শব্দ গঠন

যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের পূর্বে বসে অর্থ বা কাজের পরিবর্তন ঘটায় তাকে উপসর্গ বলে। 'প্র' তেমনি একটি উপসর্গ। নিম্নে উক্ত উপসর্গের ব্যবহার দেখানো হল:

প্র-	বিশেষভাবে অর্থে	: প্রশাসন, প্রচেষ্টা, প্রমাণ, প্রদান, প্রভাব।
	সামনের দিকে অর্থে	: প্রগতি, প্রসার, প্রাগ্রসর।
	সম্যক উৎকৃষ্ট অর্থে	: প্রগতি, প্রমূর্ত, প্রমোদ, প্রকৃষ্ট, প্রযত্ন।
	আধিক্য অর্থে	: প্রলয়, প্রবল, প্রতাপ, প্রকোপ, প্রসার, প্রগাঢ়, প্রচার, প্রকল্প।

বানান সতর্কতা

য-লা/ষ-লা আ-কার (্য/্ষ/া)

ব্যবসা, ব্যবহার, ব্যবস্থা, ব্যয়, ব্যাধি, ব্যাপক, ব্যাহত।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ল্যাটিন শব্দ 'Corruptus' এর অর্থ কী?

ক. বিধ্বস্ড় খ. ধ্বংস

গ. নষ্ট ঘ. বিকৃত

২. 'ম্যানুয়াল অন অ্যান্টি করাপশন পলিসি' অনুযায়ী দুর্নীতি কী?

ক. অন্যের সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভ ও হস্তক্ষেপ

খ. সরকারি সিদ্ধান্ড়াস্কায়নে সম্পদের অপব্যবহার

গ. সিদ্ধান্ড়াস্কায়নে আইনি জটিলতা

ঘ. ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার

৩. দুর্নীতিপ্রবণ দেশে নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণ হল-

i. প্রাপ্য মজুরির বঞ্চনা

ii. দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি

iii. সম্পদের বৈষম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i ,ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কুদ্দুস আলী ভূমি অফিসের কর্মচারী। অফিসে উপরি আয়ের সুযোগ থাকায় প্রচুর টাকার মালিক হন তিনি। এলাকায় অভাবের তাড়ানায় বেচে দেওয়া দরিদ্রের ফসলি জমি থেকে বসতিভিটা পর্যন্ড়কিনে সম্পদ গড়েছেন তিনি। তাছাড়া ছলে বলে, কলে- কৌশলেও অনেকের সম্পত্তি হাতিয়েছেন তিনি।

৪. কুদ্দুস আলীর আচরণে 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্ড়ায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. ভোগবাদী মনোভাব খ. ভূমি দস্যুতা

গ. দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ঘ. অহমিকাবোধ

৫. উক্ত আচরণ সমাজ জীবনের মানুষের ওপর যে প্রভাব ফেলবে তাহল-

i. নিরাপত্তাহীনতা

ii. আয় বৈষম্য বৃদ্ধি

iii. সম্পদের প্রতি আসক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i ,ii ও iii

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিশ্বজিত 'সমাজ জাগরণ' নামে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সুনামের সাথে কাজ করছে। সম্প্রতি সংস্থাটির নিয়োগ শাখা দক্ষকর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি দিলে কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী আবেদন করে। কিন্তু এবারের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীরা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আশানুরূপ দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হয়। বিশ্বজিত লক্ষ্য করলেন নিয়োগ শাখার কিছু কর্মী চলাফেরায় বিলাসী হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে কিছু কর্মী বাড়ি-গাড়ির মালিক বনে গেছে।

ক. সুশাসন কী?

খ. বাজার অস্থিতিশীলতার পেঁছনে সিন্ডিকেটের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় সংস্থাটির ত্রুটি 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কী পদক্ষেপ উলিস্নখিত প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারত, প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই
এটাই হোক মোদের শোস্নান
পকেটে কালো টাকা
মুখোশে মুখ ঢাকা
তাদের মুখোশ মোরা খুলব
নীতির আড়ালে যারা
লুকিয়ে আছে তারা
জনতার কাছে তুলে ধরব।
'৭১-এ মোরা স্বাধীনতা এনেছি
আরো একটা স্বাধীনতা চাই
সোনার বাংলাদেশে
দেখব অবশেষে
দুর্নীতি বলতে কিছু নাই।

ক. জবাবদিহিতা কী?

খ. দুর্নীতিরোধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন কেন?

গ. 'পকেটে কালো টাকা মুখোশে মুখ ঢাকা'- এখানে কবি কাদের উদ্দেশে এ কথা বলেছেন? দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতায় ব্যক্ত প্রত্যয়টি যেন স্বাধীনতা অর্জনে যুবসমাজের ভূমিকার প্রতিচ্ছবি- তোমার পঠিত প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

অপরাহ্নের গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্যগজতে হুমায়ূন আহমেদ যাদুকরী নাম। মূলত ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ-এর প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। এই অর্থে তাঁকে সমকালীন আখ্যানকার বলা যায় তাঁর আর একটি পূর্ব সাহিত্যকর্ম হল 'শঙ্খনীল কারাগার।

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার কুতুবপুর গ্রামে। রসায়নের মেধাবী ছাত্র ড. হুমায়ূন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্নাস ও মাস্টাস উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পলিমার কেমিস্টিতে গবেষণার জন্য পি.এইট.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের এ অধ্যাপক ১৯৮১ সালে তার সাহিত্যেকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি পান সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান-একুশে পদক। এছাড়াও পেয়েছেন শিশু একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, শিল্পাচার্য 'জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক সহ আরো অনেক পুরস্কার। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ড়দীর্ঘ সময়ে তাঁর উপন্যাস সমগ্র'র দশম খন্ডই শুধু প্রকাশিত হয়নি সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' এবং এক আশ্চর্য চরিত্র মিসির আলীর আখ্যান নিয়ে 'মিসির আলী অমনিবাস'। তাঁর রচিত একাধিক জনপ্রিয় কাহিনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে টেলিভিশন নাটক। অসংখ্য নাটক ও উপন্যাস রচয়িতা হুমায়ূন আহমেদ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবি 'আগুনের পরশমনি' শ্রেষ্ঠ ছবিসহ ৮টি শাখায় পেয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

প্রায় এক যুগ আগের কথা (১৯৯৪), আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মানুষের জন্যে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করবে। বিষয় এইডস। জনসচেতনমূলক ছবি। ডকুমেন্টারি তৈরির দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। আমি গভীর জলে পড়লাম। এইডস বিষয়ে আমার জ্ঞার শূন্যের কাছাকাছি। শুধু জানি এটি একটি ভাইরাসঘটিত ব্যাধি। যে ভাইরাস থেকে রোগটা হয় তার নাম Human Immune Deficiency Viruys। সংক্ষেপে HIV ঘাতক ব্যাধি। ওষুধ আবিষ্কার হয় নি। এইডস হওয়া মানেই মৃত্যু।

শূন্যজ্ঞান নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরিতে হাত দেওয়া যায় না। বিষয়টি ভালোমতো জানা দরকার। একজন এইডস এর রোগীকে খুব কাছ থেকে দেখা দরকার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিলেটের এক গ্রামে একজন এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া গেল। তার নাম আব্দুল মজিদ। সে কাজ করত ইন্দোনেশিয়ায়। ঘাতক ব্যাধি সে বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রোগীর আত্মীয়স্বজনরা হৈ চৈ শুরু করল, আব্দুল মজিদের এইডস হয় নি। সবই দুষ্টু লোকের রটনা। আব্দুল মজিদ নেক ব্যক্তি; আদর্শ জীবন যাপন করেন ইত্যাদি।

আমার লেখক পরিচিতির কারণেই হয়তোবা রোগীর দেখা পাওয়া গেল। ছোট্ট একটা ঘরে কঙ্কালসার একজন মানুষ শীতলপাটিতে শুয়ে আছে। একটু পর পর সে হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ঠোঁটের কাছে কয়েকটা মাছি বসে আছে। হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ক্ষমতাও মানুষটির নেই। তার চোখ যক্ষ্মারোগীর চোখের মতো জ্বলজ্বল

করছে। সে প্রতীক্ষা করছে মৃত্যুর। বেচারাকে দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল নিজের অজান্তেই তার কপালে হাত রাখলাম। সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, তার এইডস হয়েছে এটা সত্যি। সে কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে এটাও সত্যি। তার একমাত্র দুঃখ কেউ তার কাছে আসে না। তার স্ত্রী দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। কেউ তার ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না। তাকে খাবার দেওয়া হয় জানালা দিয়ে। তার ঘরের একটা মাত্র জানালা, সেটাও থাকে বন্ধ। অথচ সে পরিবারের জন্য কত কিছুই না করেছে।

সে মাথা নিচু করে বলল, বিদেশ থেকে নিয়ে আসছি। খারাপ মেয়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল। আমার পাপের শাস্তি।

পৃথিবীতে অনেক ব্যধিকেই পাপের শাস্তি কিংবা ঈশ্বরের অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়েছে। যেমন- কুষ্ঠ রোগ এইডস রোগ এর কপালে পাপের শাস্তির সিল ভালোমতো পড়েছে, কারণ সম্ভাবত এ রোগের সঙ্গে অসংযত যৌনতার সরাসরি সম্পৃক্ততা।

এ রোগ প্রথম ধরা পড়ে সমকামীদের মধ্যে (১৯৮১ সাল, নিউইয়র্ক এবং ক্যালফোনিয়া)। শুরুতে গবেষকরা ধারণা করেছিলেন, এ রোগের প্রধান কারণ সমকামিতা। এ ধারণা এখন আর নেই। ১৯৮৩ সনে ফরাসি গবেষক লুক মনটরগনিয়ার এবং ১৯৮৭ সনে আমেরিকার রবার্ট গ্যালো আবিষ্কার করেন ভাইরাসঘটিত এজেন্ট HIV টাইপ ওয়ান থেকে এইডস ব্যাধির সৃষ্টি। পশ্চিম আফ্রিকার এইডস রোগীদের পরীক্ষা করে HIV টাইপ টু বের করা হয়। এইচআইভি'র প্রধানকাজ, মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া। টাইপ ওয়ান এ কাজটি দ্রুত, টাইপ ভাইরাস কাজ করে ধীরে। রোগের লক্ষণ জটিল কিছু না-দূর্বলতা, জ্বর, ডায়রিয়া, লসিকা গ্রন্থির ফুলে যাওয়া। এই অতি সাধারণ লক্ষণের অসুখ এক সময় সংহারকমূর্তি ধারণ করে।

এই কালান্তক ব্যাধির ভয়াবহতার কারণেই জাতিসংঘে গঠিত হয়েছে এইডস বিষয়ক সংস্থা (UNAIDS)। ১লা ডিসেম্বরকে বিশ্ব এইডস দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন সারা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে দিবসটি পালন করা হয় নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে। উদ্দেশ্য একটি মানুষকে যত পারা যায় সচেতন করে তোলা জাতিসংঘের এইডস সংস্থার পরিসংখ্যা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। ২০০৫ সনের হিসেবে এইচআইভি সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা ছিল চার কোটির বেশি। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতিদিন ১৪ হাজার মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে। অসচেতনতার কারণে প্রতিদিন ৮২০০ মানুষ এইডস আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। সাহারা মরুভূমির চারপাশের আটচল্লিশটি দেশে এখন মৃত্যুর প্রধান কারণ এইডস। অনেক দেশেই এই মরণব্যাধি মানুষের গড় আয়ু দশ বছর কমিয়ে দিয়েছে। ভারত, নেপাল, বার্মা, চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডে এইডস দ্রুত ছড়াচ্ছে।

সেই তুলনায় আমরা এখনো ভালো আছি। ঘোড়া এখনো লাগামছাড়া হয়নি। UNAIDS এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা ১৩৪, এইডস থেকে মৃত্যুর সংখ্যা ৭৪, এইচআইভি পজেটিভ মানুষের সংখ্যা ৬৫৮। এই পরিসংখ্যানে আনন্দে উল্লসিত হবার কিছু নেই। কারণ এরই মধ্যে বাংলাদেশে এইচআইভি এইডস আক্রান্তের সংখ্যা এক বছরে ৬৫৮ থেকে বেড়ে ৮৭৪ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে এইডস আক্রান্ত হয়েছে ২৪০ জন এবং মারা গেছে ১০৯ জন।

সুতরাং পাগলা ঘোড়া সে কোনো সময় লাগামছাড়া হতে পারে। কীভাবে পারে, তা ব্যাখ্যা করার আগে এইডস কীভাবে ছড়ায় সে সম্পর্কে একটু বলে নিই।

মানুষের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস কোথায় থাকে? তার অবস্থান তিন জাতীয় তরল পদার্থে বীর্যে, রক্তে এবং মায়ের দুধে। কাজেই রোগ ছড়াবে তিন জাতীয় তরলের আদান-প্রদানে।

ক. এইচআইভি আক্রান্তরাগীর সঙ্গে অনিরাপদ যৌন মিলনে। অনিরাপদ যৌন মিলনের অর্থ কনডমবিহীন যৌন মিলনে। লিখতে অস্বস্তিলাগছে, কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে স্পেডকে স্পেড বলাই বাঞ্ছনীয়।

খ. রক্ত আদান-প্রদান। এইচআইভি আক্রান্তরাগীর রক্ত শরীরে নেওয়া।

গ. শিশুরা এইচআইভি তে আক্রান্তহয় মায়ের দুধ পানে।

বাংলাদেশ শিক্ষায় অনগ্রসর হতদরিদ্র একটি দেশ। পতিতাবৃত্তি দরিদ্র দেশের অনেক অভিশাপের একটি। যৌনকর্মীরা (নারী এবং পুরুষ) নগরে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শিক্ষিত আধুনিক তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নৈতিকতা অনুশাসন তেমনভাবে কাজ করছে না। অবাধ মেলামেখাকে এখন অনেকেই আধুনিকভাবে অংশ মনে করছে। তথাকথিত এই আধুনিকতার কারণে তারা যে বড় ঝুঁকির মধ্যে আছে তা তারা বুঝতে পারছে না।

বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে আছে এ দেশের মেয়েরা। তাদের যৌনশিক্ষা নেই বললেই হয়। মূল কারণ যৌনতা-বিষয়ক সমস্যাপারটাই এ দেশে ট্যাবু। সমাজে মেয়েদের অবস্থান দুর্বল। অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক বাধা দেবার ক্ষমতাও এদের নেই।

আমাদের পাশের দেশগুলির এইডস রোগ বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এসব দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। আনন্দ-পিপাসুরা সেসব দেশে যাচ্ছেন। ভিনদেশের যৌনকর্মীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হচ্ছে। তারা দেশে ফিরছেন এইচআইভি ভাইরাস নিয়ে। নিজেরা কিন্তু টক করে সেটা বুঝতে পারছেন না। কারণ এইচআইভি মানুষের শরীরে দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দশ বছর এইচআইভি থাকবে ঘুমন্ত এইচআইভি ঘুমন্তথাকলেও এইচআইভি বহন করা মানুষেরা তো ঘুমন্তনা। তারা মহানন্দে তাদের শরীরে এইচআইভি ছড়িয়ে বেড়াবেন। জাতি অগ্রসর হবে ভবিষ্যৎহীন অন্ধকারের দিকে।

বাংলাদেশে মাদক গ্রহণের সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। হিরোইন আসক্তরা সুচ দিয়ে শরীরে বিষ ঢোকাচ্ছে। একই সুচ অন্যরাও ব্যবহার করছে। এইচআইভি ভাইরাস ছড়ানোর কী সুন্দর সুযোগ।

এ দেশের কিছু অসহায় মানুষ বেঁচে থাকেন শরীরের রক্ত বিক্রি করে। তাদেরই কারো এইচআইভি পজিটিভ রক্ত যখন অন্য কাউকে দেওয়া হবে তখন অবস্থাটা কী হতে পারে? অনেক উন্নত দেশেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। দূষিত রক্ত মিশে গেছে বাচ্চ ব্যাংকের রক্তে।

সিলেটের এইডস রোগীর কাছে ফিরে যাই। আমি রোগীর আত্মীয়স্বজনকে ডেকে বোঝালাম যে এ রোগ অন্যান্য ছোঁয়াছে রোগের মত না। স্বাভাবিক মেলামেশায় এ রোগ ছড়াবে না। এইডস রোগী যে গ্লাসে পানি খাচ্ছে সেই গ্লাসে অন্য কেউ যদি পানি পান করে তাতেও তার রোগ হবে না। আমার কথায় তেমন কাজ হল বলে মনে হল না। তারা রোগীর দিকে ঘৃণা এবং ভয় নিয়ে তাকিয়ে রইল।

পশু-পাখিদের মধ্যে কেউ যদি রোগগ্রস্তহয় তখন আমরা তাদের ত্যাগ করে। রোগীকে মরতে হয় সঙ্গীবিহীন অবস্থায় একা একা। মানুষ তো পশুপাখি না। মানুষ রোগীকে দেখবে পরম আদরে এবং মমতায়। রোগকে ঘৃণা করা যায় রোগীকে কেন?

আমি এইডস রোগী আব্দুল মজিদকে (আসল নাম না, নকল নাম) বললাম, ভাই আমি AIDS নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি বানাব। আপনি কি সেখানে কাজ করবেন?

আব্দুল মজিদ ক্লান্তালায় বলল, "আমার লাভ কী? আমি তো মরেই যাব।"

আমি বললাম, 'আপনার লাভ হল, ডকুমেন্টারি দেখে বাংলাদেশের মানুষ সাবধান হবে।' আব্দুল মজিদ রাজি হলেন। তবে শেষ পর্যন্ড়কাজ করতে পারলেন না। আমি সিলেট থেকে ফিরে চিত্রনাট্য তৈরি করার পর পরই শুনলাম তিনি মারা গেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

অপরাহ্নের গল্প	-	আক্ষরিক অর্থে বিকালের গল্প। গল্পে লেখক বিকাল বলতে জীবনের পড়ন্ড়বেলা অর্থাৎ জীবনের শেষ পরিণতিকে ইঙ্গিত করেছেন।
ডকুমেন্টারি (Documentary)	-	প্রামাণ্য। ডকুমেন্টারি ফিল্ম-প্রামাণ্য চিত্র।
এইডস (AIDS)	-	Acquired Immune Deficiency Sendrome-এইডস এক ধরনের ভাইরাসঘটিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ড়হলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে।
ভাইরাস (VIRUS)	-	সংক্রামক রোগের বীজ।
ইন্দোনেশিয়া	-	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ। প্রায় ১৭০০০ দ্বীপ নিয়ে এ দেশটি গঠিত। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জন মুসলমান। বর্তমান জনসংখ্যা সাড়ে ২৩ কোটি। ১৯৪৫ সালে দেশটি হল্যান্ড-এর কাছ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা।
নেক ব্যক্তি	-	পুণ্যবান ব্যক্তি বা মানুষ।
কঙ্কালসার	-	হাড়-পাঁজর মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন অত্যন্ড়ীর্ণ।
প্রতীক্ষা	-	অপেক্ষা। অজান্ড়েকাউকে না জানিয়ে। অজ্ঞাতসারে।
অভিশাপ	-	আভিসম্পাত। অনিষ্টকামনা।
কুষ্ঠ রোগ	-	মহারোগবিশেষ। তবে আজকাল কুষ্ঠ রোগের সহজ চিকিৎসা রয়েছে।
যৌনতা	-	স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ-উত্তর কামপ্রবৃত্তি।
সমকামী	-	আসমলিঙ্গভুক্ত যৌনকামী।

নিউইয়র্ক	-	আমেরিকার বৃহত্তম শহর। আয়তন ৮০০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৮০ লক্ষ।
ক্যালিফোর্নিয়া	-	আমেরিকার ৩য় বৃহত্তম প্রদেশ। আয়তন প্রায় ৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ। এর অন্যতম দুটি শহর লস এঞ্জেলেস ও সানফ্রান্সিসকো।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা	-	রোগ নিবারণ ক্ষমতা। যে শারীরিক ক্ষমতায় মানুষ রোগ প্রতিহত করতে পারে।
ডায়রিয়া (Diarrhoea)	-	পেটের অসুখ। ঘনঘন পাতলা পায়খানা।
লসিকা গ্রন্থি	-	লসিকা গ্রন্থি হচ্ছে এমন এক ধরনের গ্রন্থি যা শরীরেকে বিভিন্ন জীবাণু ও ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে রক্ষা করে। সাধারণত মানুষের ঘাড়ে, বগলে ও কুঁচকিতে লসিকা গ্রন্থি বেশি থাকে।
সংহারক	-	সংহারকারী। বিনাশকারী।
জাতিসংঘ	-	(United Nations Organization-UNO)- দেশে দেশে শান্তি্‌ নিরাপত্তা এবং বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯৪৫ সালে ২৪ শে অক্টোবর সানফ্রান্সিসকোতে মাত্র ৫০টি সদস্য-রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয় বর্তমানে এর সদস্য-রাষ্ট্র সংখ্যা ১৩২।
আড়ম্বর	-	জাঁকজমক। পরিসংখ্যান (Statistics) - গণনা। কোনো বিষয়ের তথ্যসূচক হিসাব।
সংক্রমিত	-	এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত।
আক্রান্ত	-	ব্যাধিগ্রস্ত পীড়িত।
উলিস্নত	-	আনন্দিত। উৎফুল্ল
স্পেডকে স্পেড বলা	-	গল্পে 'বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত।
অনগ্রসের	-	অগ্রগামী নয়। পিঁছিয়ে পড়া।
হতদরিদ্র	-	খুবই গরিব। অভাবগ্রস্ত অসচ্ছল।
পতিতাবৃত্তি	-	বেশ্যাবৃত্তি। যৌনপেশা।
যৌনকর্মী	-	যৌনকর্ম যার পেশা। পতিতা।
ট্যাবু (Taboo)	-	নিষিদ্ধ। অলঙ্গনীয়।
সুপ্ত	-	ঘুমন্ত

হিরোইন (Heroin)	-	মাদকদ্রব্য। মরফিন থেকে তৈরি মাদকবিশেষ।
আসক্ত	-	অতিশয় অনুরক্ত।
ব্লাড ব্যাংক	-	রক্তভান্ডার। অসুস্থ বা আহতদের জন্য সুস্থ মানুষের দেহ থেকে আহরিত রক্তের সঞ্চয়-ভান্ডার।
ছোঁয়াচে রোগ	-	স্পর্শ সংক্রমিত হয় এমন রোগ।
রোগগ্রস্ত	-	রোগাক্রান্ত মমতা-স্নেহ। মায়া। ভালবাসা।

অনুশীলনমূলক কাজ

☐ বিশুদ্ধ উচ্চারণ

প্রদত্ত শব্দ		শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ
লেখক	-	লেখক্ [ল্যাখোক' নয়]
নিঃশ্বাস	-	নিশ্‌শাশ
প্রতীক্ষা	-	প্রোতিক্‌খা
মন	-	মোন
পর্যন্ত	-	পোর্‌জনতো
লক্ষণ	-	লোকখোন্
অনুশাসন	-	ওনুশাশোন্
দেশ	-	দেশ ['দ্যাশ' নয়]
অতিক্রম	-	ওতিকক্রোম্
গ্লাস (Glass)	-	গ্লাস্ ['গ্লাস্' নয়]
দেখবে	-	দেখ্‌বে ['দ্যাখবে' নয়]
দেখা	-	দ্যাখ্যা ['দেখা' নয়]
হল	-	হোলো
একা	-	অ্যাকা ['একা' নয়]
একটি	-	এক্‌টি ['অ্যাক্‌টি' নয়]
শেষ	-	শেশ্ ['শ্যাশ্' নয়]

☐ বানান সতর্কতা

ব্যাধি	কুষ্ঠ
ভালোমতো	সম্পৃক্ততা
সংক্রমিত	মরণ

কীভাবে	অস্বস্ড়ি
ভবিষ্যৎ	আসক্ত
দূষিত	ছোঁয়াচে
রোগগ্রস্ড়	তৈরি
রাজি	অপরাহ্ন

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এইডস রোগটি কখন প্রথম ধরা পড়ে?

ক. ১৯৮১ সালে খ. ১৯৮৩ সালে

গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৯৯৪ সালে

২. বাংলাদেশের মেয়েরা এইডস রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে। কারণ, এখানে-

i. যৌনতা বিষয়টি গোপনীয় ও লজ্জাকর

ii. যৌন শিক্ষার প্রচলন নেই

iii. সামাজিকভাবে মেয়েদের অবস্থান দুর্বল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i ,ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং এর ভিত্তিতে ৩ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

তরুণ মফিজ এইডস রোগে আক্রান্ড় সম্প্রতি সে বিয়ে করেছে।

৩. মফিজ কোনটি থেকে বিরত থাকবে?

ক. একত্রে খাওয়া-দাওয়া খ. একই বিছানা ব্যবহার

গ. সন্ড়্গ নেওয়ার চেষ্টা ঘ. একই গোসলখানা ব্যবহার

৪. মফিজ এবং তার স্ত্রীর জন্য কোনটি আবশ্যক?

ক. বিবাহবিচ্ছেদ খ. পৃথক বিছানা

গ. কনডম ব্যবহার ঘ. ভিন্ন খাবার

৫. স্ত্রীকে নিয়ে মফিজ স্বাভাবিক সংসার করতে পারবে যদি তারা-

i. যৌন মিলনে নিরাপদ থাকে

ii. পৃথক বিছানা ব্যবহার করে

iii. সন্ড়্গ আকাঙক্ষা ত্যাগ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i ,ii ও iii

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সৈয়দ সাহেব যখন নয় বছরের কুসুমকে তুলে আনলেন তখনো বোঝা যাচ্ছিল না সে বেঁচে আছে কিনা! এ অবস্থায় তিনি ভাবছেন এই তো সেদিন ওর বাবা বিদেশ থেকে এল। বাবা যেদিন মারা গেল সেদিন কুসুমের জন্ম। এতদিন সে পরহেজগার মায়ের আশ্রয়ে পূর্ণ নিরাপত্তায় ছিল। গেল মাসে মেয়েটির মাও মারা গেল। কত মানুষেরই তো মা-বাবা থাকে না। তাই বলে আত্মহত্যা! অনেক চেষ্টায় কুসুমের জ্ঞান ফিরলে জানা গেল তার রক্তে HIV পজেটিভ পাওয়া গেছে। তার মায়ের মৃত্যুর কারণও তাই। আপন ভাই-বোনেরা তাকে একঘরে করে দিয়েছে। কেউ তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না। মেলামেশা করে না। এমনকি কথা পর্যন্ড়লে না।

ক. HIV রোগ প্রথম কোথায় ধরা পড়ে?

খ. এ দেশে যৌনতা বিষয়কে 'ট্যাবু' বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কুসুমের HIV আক্রান্ড়ওয়ার কারণ 'অপরাহ্নের গল্প' অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৈয়দ সাহেব কুসুমকে উদ্ধার করে HIV সংক্রমনের ঝুঁকি নিয়েছেন।' 'অপরাহ্নের গল্প' অবলম্বনে বিশেষণ কর।

২. মাজহার সাহেব বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অফিসের কাজে তিনি রংপুরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েন। গুরুতরভাবে আহত মাজহার সাহেবকে নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাকে রক্ত দেওয়া হয়। মাসখানেক পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ছয় মাস পরে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারলেন তিনি HIV ভাইরাসে আক্রান্ড় তিনি বুঝতে পারলেন দুর্ঘটনার সময় তিনি জীবন বাঁচাতে যে রক্ত গ্রহণ করেছিলেন আজ সেই রক্তই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক. আব্দুল মজিদ কোথায় কাজ করতেন?

খ. 'রোগকে ঘৃণা করা যায়, রোগীকে নয়।'- এর দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন।

গ. মাজহার সাহেবের HIV ভাইরাসে আক্রান্ড়বার কারণ 'অপরাহ্নের গল্পে' কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মাজহার সাহেব দুর্ঘটনার সময় জীবন বাঁচাতে যে রক্ত গ্রহণ করেছেন আজ তাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' উক্তিটির তাৎপর্যতা 'অপরাহ্নের গল্পের' আলোকে বিশেষণ কর।

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ প্রতিভাধর কবি। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জনক। তাঁর সমগ্র জীবন ঘটনাবহুল ও অত্যন্ড়নাটকীয়। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর তীব্র অনুরাগ। খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' নামটি যুক্ত হয়।

মধুসূদন গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয় ইত্যাদি ১৩/১৪ টি ভাষা শিখেছিলেন এবং পাশ্চাত্য চিরায়ত সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন।

সাহিত্যচর্চার শুরুতে তিনি ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ভুল ভাঙলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে অবদান রেখে চিরস্মরণীয় হন তিনি।

মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কাব্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করেন। তাঁর বিখ্যাত ' মেঘনাদ বধ কাব্য' বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকব্য।

'শর্মিষ্ঠা' 'পদ্মাবতী' ইত্যাদি আধুনিক বাংলা নাটকের প্রথম রচয়িতাও তিনি। তাঁর লেখা 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম দু'টি সার্থক প্রহসন। প্রথম বাংলা সনেট রচয়িতাও তিনি। তাঁর লেখা সনেটগুলো 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মাইকেলের অন্য কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা'। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম যশোর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে।

হে বঙ্গ, ভা ারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;-
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,–
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

শব্দার্থ ও টীকা

হে বঙ্গ	-	বঙ্গ বলতে কবি বাংলা ভাষাকেই বুঝিয়েছেন এবং তাকেই সম্বোধন করেছেন।
ভান্ডারে তব বিবিধ রতন	-	বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভান্ডার বৈচিত্রময় ও উৎকর্ষমন্ডিত সাহিত্য-সম্পদে পরিপূর্ণ।
তা সবে	-	সে সবকে, সেগুলোকে।
অবোধ	-	নির্বোধ, কান্ডজ্ঞানহীন।
পরধন- লোভে মত্ত	-	পরের সম্পদের লোভে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট। পরধন বলতে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে বুঝিয়েছেন। কবি মধুসূদনের স্বপ্ন ও আকাঙক্ষা ছিল ইংরেজি সাহিত্যের কবি হবার। তাই তিনি পাশ্চাত্যে সাহিত্যের ভাব-সম্পদ আহরণে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূচনা হয়েছিল ইংরেজি সাহিত্যে রচনার মাধ্যমে। পরে ভুল বুঝতে পেলে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।
পরদেশে	-	বিদেশের সাহিত্যক্ষেত্য। ইউরোপে কবির প্রবাসজীবনের কথা এখানে বলা হয়নি। কারণ সাহিত্য জীবনের শেষে অর্থোপার্জনের আসায় কবি দেশত্যাগ করেছিলেন।
ভিক্ষাবৃত্তি	-	বিদেশি সাহিত্যকে পরধন বিবেচনা করায় তার চর্চাকে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সমতুল্য মনে করেছেন। নিজের সম্পদকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষায় সম্পদের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনার বোধ এখানে প্রকাশিত হয়েছে।
কুক্ষণে	-	অশূভ সময়ে। অনভিপ্রেত মুহূর্তে।
আচরি	-	আচরণ করে। অবলম্বন করে।
কাটাইনু	-	কাটালাম।
পরিহরি	-	পরিহার করে। ত্যাগ করে। এখানে বঞ্চিত হয়ে।
সঁপি	-	সঁপে, সমর্পণ করে।
কায়	-	দেহ, শরীর।
মনঃ	-	মন, অন্তঃ, অন্তঃকরণ, চিত্ত।
মজিনু	-	মগ্ন হলাম, বিভোর হলাম, অত্যধিক আসক্ত হলাম।
বিফল তপে	-	নিষ্ফল বা ব্যর্থ তপস্যায়।

অবরেণ্যে	-	যা বরণ বা গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশি ভাষাকে পরধন হিসেবে দেখেছেন বলেই কবি 'অবরেণ্যে' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োগটিকে এই অর্থেও হয়ত নেওয়া যেতে পারে-যা বরণ করা বা গ্রহণ করা বা সাধ্য বা সামর্থ্যের বাইরে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বহুভাষাবিদ বাঙালি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ বহু সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; কিন্তু মাতৃভাষার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না-এই বোধই কবিকে তাঁর নিজের ভাষা-সাহিত্যের কাছে ফিরিয়ে এনেছিলেন।
বরি	-	বরণ করে। কবি মধুসূদন তাঁর সাহিত্য-চর্চার শুরুতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মাদ্রাজে থাকাকালে প্রচন্ড পরিশ্রম করেন বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে। মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষার কাব্য রচনা করার জন্য যে প্রয়াস সে সময়ে তিনি চালিয়েছিলেন তা যে ব্যর্থ প্রয়াস ছিল তা তিনি শেষ পর্যন্ড়বুঝতে পারেন। এখানে আক্ষেপের সুরে সে কথাই বলেছেন তিনি।
কেলিনু	-	খেলা করলাম।
শৈবাল	-	শ্যাওলা।
কমল-কানন	-	পদ্মবন।
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন-		কবি বাংলা ভাষাকে পদ্মের এবং ইংরেজি ভাষাকে শ্যাওলার সঙ্গে উপমিত করেছেন। কবির বক্তব্য: বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করে তিনি ভুল করেছেন এবং তার সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। এ যেন পদ্মবনকে উপেক্ষা করে শ্যাওলা নিয়ে খেলা করা।
কুললক্ষ্মী	-	মাতৃভাষায় কবিতা রচনার দৈবী প্রেরণাকে কবি মাতৃভাষার আধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে কল্পনা করেছেন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে-		মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার মূলে কবি যে গভীর প্রেরণা অনুভব করেছিলেন তাকে কবি বাংলা ভাষায় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বপ্নাদেশ বলে কল্পনা করেছেন।
মাতৃকোষে	-	মাতৃভাষার ভান্ডারে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে।
রতনের রাজি	-	রত্নসমূহ অর্থাৎ বিচিত্র ঐশ্বর্যময় সাহিত্যনিদর্শনগুলো।
এ ভিখারি-দশা	-	কবি ভিখারীর মতো বিদেশি সাহিত্যের দুয়ারে হাত পেতেছিলেন।
যা রে ফিরে ঘরে	-	মাতৃভাষার সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্রতী হও।
আজ্ঞা	-	আদেশ, নির্দেশ।
পালিলাম	-	পালন করলাম, মান্য করলাম।

কালে	-	যথাসময়ে, এক সময়ে।
মাতৃভাষা রূপ-খনি পূর্ণ মণিজালে	-	মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভান্ডার যেন খনির মতো অনন্ড়রত্নসম্পদের আকর। খনি থেকে যেমন বিচিত্র রত্নরাজি লাভ করা যায় তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অজস্র ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলে যেসব সুকাব্যের কথা কবি তাঁর 'চতুর্দশপদী 'চন্ডীমঙ্গল', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কালিদাসের ' মেঘদূত' ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ।

উৎস

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টম্বর-অক্টোবরে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে জানান তিনি বাংলা ভাষায় সনেট লেখা শুর“করেছেন এবং 'কবি-মাতৃভাষা' নামে একটি সনেট লিখেছেন। পরবর্তীকালে এই সনেটটি পরিবর্তিত নবরূপে 'বঙ্গভাষা' নামে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে স্থান লাভ করে।

ছন্দ

'বঙ্গভাষা' কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতিটি চরণে ১৪ মাত্রায় দুটি পর্ব। প্রথম পর্ব ৮ মাত্রায় ও দ্বিতীয় পর্ব ৬ মাত্রার।

নির্মাণ শৈলী ❑ সনেট

সনেট কবিতার একটি বিশেষ ধরনের রূপকল্প। একটি সনেটে ১৪টি পঙ্‌ক্তি থাকে। ওই ১৪ পঙ্‌ক্তি ৮ পঙ্‌ক্তি ও ৬ পঙ্‌ক্তিতে বিভাজিত হয়-প্রথম ৮ পঙ্‌ক্তিকে বলে অষ্টক (octave), আর শেষ ৬ পঙ্‌ক্তিকে বলে ষটক (sestet)। একটি সনেট একটি মাত্র ভাবের বাহন, তার মধ্যেও অষ্টকে-ষটকে একটু পার্থক্য থাকে। অষ্টকে যে ভাব প্রকাশিত হয় ষটকে তার সম্প্রসারণ থাকে অনেক সময়-বা ঈষৎ সরানো বক্তব্য-এমনকি বিরোধী কোনো প্রশ্নও উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু অষ্টক-ষটক মিলিয়ে কবিতার একটি অখন্ড মন্ডল রচিত হয়। গঠনের দিক থেকে সনেট প্রধানত দু'রকম: পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয়।

'বঙ্গভাষা' সনেটটি রীতি বা মিলের দিক থেকে অনিয়মিত ধরনের। কবিতার চরণগুলোর অন্ড়মিল এরকম : কখ কখ, খক খক, গঘ ঘগ, ঙঙ। কবিতার প্রথম চারটি চরণ ও শেষ দু'টি চরণ শেক্সপীয়রীয় রীতিতে রচিত, পঞ্চম থেকে অষ্টম-এই চারটি চরণ অনিয়মিত শেক্সপীয়রীয় ঢঙের, নবম থেকে দ্বাদশ-এই চারটি চরণে পেত্রার্কীয় ঢঙ দেখা যায়।

অনন্য বৈশিষ্ট্য

এই কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের প্রভাব পড়েছে। ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করার অদম্য ইচ্ছা থেকে কবি পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্য

হিসেবে সমাদৃত না হওয়ায় তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার শুরু করেন এবং অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় এই দিকটিই অভিনব ভাবকল্পনায় বাণীরূপ পেয়েছে।

'বঙ্গভাষা' শুধু বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট নয়, এটি বাংলা সাহিত্যের সেরা সনেটসুগলোর একটি এর ভাববস্তু যেন মার্জিত, পরিশীলিত ও সংহত তেমনি শিল্পরূপ নির্মিতি উঁচুমানের। ১৪ চরণের সীমিত আঙ্গিক পরিসরে কবির অখণ্ড ভাবকল্পনা ক্রমবিকশিত হয়ে চমৎকার পরিণতি পেয়েছে। অষ্টকে বর্ণিত হয়েছে, মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষাজনিত মনোবেদনা, ষটকে আছে স্বপ্ন-নির্দেশে সাহিত্য-সাধনার ধারার পরিবর্তনে সিদ্ধি অর্জনের পরিতৃপ্তি। এই সনেটে কবি শুধু তাঁর সুগভীর হৃদয়াবেগকেই প্রকাশ করেন নি, সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে মাতৃছায়ার মহিমা এবং ঐ ভাষার প্রতি কবির সুগভীর দরদ।

'বঙ্গভাষা' কবিতাটি সনেট রচনায় মধুসূদনের অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় চিহ্নিত হয়ে আছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ভাষা অনুশীলন ❑ কাব্যে বিশেষ রূপে ব্যবহৃত শব্দে শিষ্ট চলিত রূপ

এই কবিতায় ব্যবহৃত নিচের শব্দগুলো এবং তার শিষ্ট চলিত রূপ লক্ষ করঃ

তব	-	তোমার
তা সবে	-	সে সব (কে)
সঁপি	-	সঁপে।
মজিনু	-	মজলাম। নিমজ্জিত হলাম।
করি	-	করে।
করিনু	-	করলাম।
আচরি	-	আচরণ করে।
কাটাইনু	-	কাটালাম।
পরিহরি	-	পরিহার করে।
কেলিনু	-	খেললাম।
ভুলি	-	ভুলে।
কয়ে দিলা	-	বলে দিলো।
ফিরি	-	ফিরে।
পালিলাম	-	পালন করলাম।

এবার কবিতাটিকে শিষ্ট চলিত গদ্যে রূপান্তর কর।

অ-, অন-উপসর্গ

অ-, অন-উপসর্গ অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দটিকে না- বোধক অর্থ (নয়,নেই ইত্যাদি) দেয়। যেমন-

বোধ / অবোধ

নিদ্রা / অনিদ্রা

আহার / অনাহার

বরেণ্য / অবরেণ্য

জ্ঞান / অজ্ঞান

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
   ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
   গ. মুক্তক ঘ. অক্ষরবৃত্ত

২. 'মজিনু বিফল তপে'— চরণাংশে বোঝানো হয়েছে কবির—
   ক. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবহেলা
   খ. ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ
   গ. বাংলা ভাষার সৌন্দর্যে অনাসক্তি
   ঘ. ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় ব্যর্থতা

নিচের কবিতাংশ দুটো লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপখনি; পূর্ণ মণিজালে।
****
মায়ের মুখের ভাষা যেন মনি মুক্তাহেম,
রচনা করিয়া যত অলংকার ভরে তুলি
মায়ের ভাঁড়ার!

৩. কবিতাংশ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে এর—
   i. ভাবে
   ii. ছন্দে
   iii. অলংকারে

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কবিতাংশ দুটির এই সাদৃশ্য নিচের কোন চরণটিতে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে?
   ক. কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
   খ. পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি
   গ. হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;
   ঘ. পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পল্লীর ঘাটে, মাঠে, পল্লীর আলো বাতাসে, পল্লীর পরতে পরতে সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। পল্লীসাহিত্য সম্পদের মধ্যে পল্লীগানগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ, শহুরে গানের প্রভাবে সেগুলো আজ বর্বর চাষার গান বলে ভদ্র সমাজে আর বিকায় না। বাংলার উপকথাগুলো এক জায়গায় জড় করলে বিশ্বকোষের মতো

বালামে তার সংকুলান হত না। প্রবাদ বাক্যে এবং ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল সঞ্চিত হয়ে আছে, কে তা অস্বীকার করতে পারে?

ক. 'কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি' চরণটিতে 'পরিহরি' শব্দটির চলিত রূপটি কী?

খ. বিদেশি ভাষায় সাহিত্য চর্চাকে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি 'ভিক্ষাবৃত্তি' বলেছেন কেন?

গ. 'বঙ্গভাষা' কবিতার অষ্টকের কোন বিষয়টি অনুচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কবিতাটি যেন 'মাতৃকোষে রতনের রাজি' এর চরণটির সার্থক পরিপূরক'— এই বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

২। যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।।
****
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।
মাতাপিতাসহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

ক. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির অষ্টকের মুলভাব কী?

খ. বিদেশী ভাষায় সাহিত্য চর্চায় কবি বিফল হলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. কবিতাংশটির শেষ চরণদুটিতে 'বঙ্গভাষা' কবিতার ষট্কের কোন পঙ্‌ক্তির ভাবার্থের প্রতিফলন ঘটেছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গঠনশৈলীর ভিত্তিতে 'বঙ্গভাষা' কবিতার ষট্কের সঙ্গে কবিতাংশটির একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অতুলনীয় ও সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, পত্রসাহিত্য, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী, সংগীত-প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে তাঁর অসামান্য প্রতিভার বিরলদৃষ্টি পরিচয়। এছাড়াও তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্প; সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক ও দক্ষ শিক্ষা সংগঠক। 'শান্তিনিকেতন' ও বিশ্বভারতী' তাঁরই অবদান। মাত্র পনর বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। আর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা নিয়ে তিনি এশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' পান। বাংলা ছোটগল্পের পথিকৃৎ তিনি। তাঁর অসাধারণ ছোটগল্পগুলো প্রধানত সংকলিত হয়েছে 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের চারটি খণ্ডে ও 'গল্পসল্প' গ্রন্থে। 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'বলকা', মানসী', 'কল্পনা', ইত্যাদি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থসহ তাঁর অজস্র গ্রন্থের মধ্যে আরও উলেখযোগ্য হচ্ছে 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি উপন্যাস, 'রক্ত করবী', 'রাজা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'ডাকঘর', 'চিরকুমার সভা', 'বিসর্জন', ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন; 'বিচিত্র' 'প্রবন্ধ','কালান্তর', 'পঞ্চভূত', 'সভ্যতার সংকট' ইত্যাদি প্রবন্ধ: 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য' ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে, বাংলা ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট, বাংলা ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা–
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা ॥
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা ॥
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা–
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা ॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু'ধারে–
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ॥

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও–
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥

যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে–আর নাই, দিয়েছি ভরে ॥
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়েছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে–
এখন আমারে লহো করুণা করে ॥

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি–
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

শব্দার্থ ও টীকা

ভরসা	-	আশা, আশ্বাস, নির্ভরশীলতা, আস্থা।
ভারা ভারা	-	বোঝা বোঝা, বহু বোঝা হয় এমন।
ক্ষুরধারা	-	ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।

http://zpaddar.org

খরপরশা - শাণিত বা ধারালো বর্শা। এখানে ধারালো বর্শার মতো।
আমি - সাধারণ অর্থে কৃষক। প্রতীকি অর্থে কবি নিজে।
আমি একেলা - কৃষক কিংবা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা প্রকাশ করছে।
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা - ধানক্ষেতটি ছোট দ্বীপের মতো। তার চারপাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। নদীর 'বাঁকা' জলস্রোতে পরিবেষ্টিত ছোট জমিটুকুর আশু বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। বাঁকা জল এখানে কালস্রোতের প্রতীক।
তরুছায়ামসী-মাখা - গাছপালার ছায়ার কালচে রং মাখা।
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে - এক অপ্রত্যাশিত মাঝি হিংস্র জলস্রোত অবলীলাক্রমে পাড়ি দিয়ে ছোট নৌকা বেয়ে এগিয়ে আসে। কে এই মাঝি? রবীন্দ্রনাথের মতে এই মাঝি আসলে মহাকালের প্রতীক।
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে - কৃষকের ধারণা, নৌকার মাঝি সম্ভবত তাঁর পূর্ব পরিচিত।
কোনো দিকে নাহি চায় - যে মাঝিকে মনে হয়েছিল পূর্ব পরিচিত বলে, তাঁর আচরণে অপরিচয়ের নির্বিকারত্ব ও নিরাসক্তি।
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?- নির্বিকার মাঝিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষকের চেষ্টা।
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে - মাঝিকে তরী ভেড়ানো জন্যে কৃষকের সনির্বন্ধ অনুনয়।
আর আছে?-আর নাই, দিয়েছি ভরে - ছোট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সমস্টাই তুলে দেয়া হয় নৌকায়।
থরে বিথরে - স্তূপে স্তূপে, সুবিন্যস্তরে।
এখন আমারে লহো করুণা করে - কৃষকের অনুনয়ে আছে ঐ তরীতে ঠাঁই পাওয়ার আকুল ইচ্ছা। কারণ তা না হলে নিষ্ঠুর স্রোতে তাঁর বিলীয়মান হওয়ায় আসন্ন আশঙ্কা।
ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী - মহাকালের প্রতীক এই তরণীতে কেবল সোনার ফসলরূপ মহৎ সৃষ্টিকর্মের ঠাঁই হয়। কিন্তু ব্যক্তিসত্তাকে অনিবার্যভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি - নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। ... সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।

উৎস ও পরিচিতি

'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এ কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্তকবিতাটি নিয়ে বহু আলোচনা, ব্যাখ্যা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে।
একটি ছোট ক্ষেত। চারপাশে প্রবল স্রোতের বিস্তার। সোনার ধান নিয়ে একলা কৃষক। অবলীলায় তরী বেয়ে আসা নেয়ে- এ কয়েকটি চিত্রকল্প ও সেগুলোর অনুষঙ্গে রচিত এক অনুপম কবিতা ' সোনার তরী'।

ক্ষুরধার বর্ষার নদীস্রোত হিংস্র হয়ে খেলা করছে দ্বীপসদৃশ ধানক্ষেতের চারপাশে। সেখানে রাশি রাশি সোনার ধান কেটে নানা আশঙ্কা নিয়ে একেলা অপেক্ষমাণ এক কৃষক। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভরাপালে তরী বেয়ে আসে এক নেয়ে বা মাঝি। নিঃসঙ্গ কৃষক আশার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, যখন তার মনে হয় মাঝিটি যেন তার চেনা। কিন্তু নির্বিকারভাবে অজানা দেশের দিকে চলে যেতে থাক সেই মাঝি। নিঃসঙ্গ কৃষক কাতর অনুনয় করে, মাঝি যেন কূলে তরী ভিড়িয়ে তার সোনার ধানটুকু নিয়ে যায়। তারপর সে ধান যেখানে খুশি, যাকে খুশি সে ইচ্ছেমত বিলিয়ে দিতে পারে। অবেশেষে ঐ সোনার তরীতে তার ভারা ভারা ফসল নিয়ে মাঝি চলে যায়, কিন্তু ছোট তরীতে কৃষকের স্থান হয় না। সোনার ধান নিয়ে তরী চলে যায় অজানা দেশে। আর শূন্য নদীতীরে অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষক একা।

এ কবিতায় একই সঙ্গে অর্ন্তীন হয়ে আছে একটি জীবনদর্শন। মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ অনিবার্য বিষয়কে এড়াতে পারে না, কেবল টিকে থাকে তার সৃষ্ট সোনার ফসল। এমনিভাবে কবির সৃষ্টকর্ম কালের সোনার তরীতে স্থান পেলেও ব্যক্তিকবির স্থান সেখানে হয় না। এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনিবার্যভাবে মহাকালের শূন্যতার বিলীন হওয়ার জন্য।

ছন্দ

কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার। আপাতভাবে কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে মনে হয়। কিন্তু সর্বশেষ স্তবকের 'শূন্য' শব্দটি আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা। 'শূন্য' মাত্রাবৃত্তে ৩ মাত্রা। সে হিসেবে 'শূন্য নদীর তীরে' ৮ মাত্রার পর্ব; অক্ষরবৃত্ত ছন্দ হলে ১ মাত্রা কম পড়ত।

অনুশীলনমূক কাজ

ভাষা অনুশীল ❑ সাপেক্ষে সর্বনাম

কখনও কখনও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দু'টি বাক্যাংশের সংযোগ সাধন করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সাপেক্ষ সর্বনাম। যেমন, 'সোনার তরী' কবিতায়: যত চাও তত লও এ রকম:

যত চেষ্টা করবে ততই সাফল্যের সম্ভাবনা।
যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা
যত গর্জে তত বর্ষে না।

এ ধরনের আরও কয়েকটি সর্বনামের উদাহরণ :

যেই কথা সেই কাজ।
যেমন কর্ম তেমন ফল।
যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

❑ নির্ধারক বিশেষণ

দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন,' সোনারতরী' কবিতায়: রাশি রাশি ভারা ভারা ধান

এ রকম আরও উদাহরণ:

লাল লাল কৃষ্ণ চূড়ায় গাছ ভরে আছে
নববর্ষ উপলক্ষে ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেছে।
এত ছোট ছোট উত্তর লিখলে হবে না।

ব্যুৎপত্তি নির্দেশ

গরজে	< গর্জে	ঠাঁই	< স্থান
বরষা	< বর্ষা	সোনা	< স্বর্ণ।
বরশা	< বর্শা।		

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন শব্দ থেকে 'বরষা' শব্দটির বুৎপত্তি?
 ক. বর্শা খ. বর্ষা
 গ. বর্ষণ ঘ. বরশা

২. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
 ক. স্বরবৃত্ত খ. অক্ষর বৃত্ত
 গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. মিশ্র

৩. "চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা" পঙ্‌ক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে—
 i. কালের গর্ভে সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা
 ii. বর্ষার পল্লীপ্রকৃতি
 iii. কবির অসহায়ত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. i ও ii খ. i ও iii
 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

 'অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি,
 হে নবীন, চলো অনায়াসে
 মৃত্যুজয়ী জীবন-উলাসে'

অনুচ্ছেদের আলোকে নিচের ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও—

৪. অনুচ্ছেদের সাথে 'সোনার তরী' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়?
 ক. অলঙ্কারে খ. বক্তব্যে
 গ. প্রেক্ষাপটে ঘ. আহ্বানে

৫. অনুচ্ছেদের সাথে তুল্য চরণ—
 ক. যেয়ো যেথা যেতে চাও
  যারে খুশি তারে দাও
 খ. ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে
  বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে
 গ. সকলি দিলাম তুলে
  থরে বিথরে
  এখন আমারে লহো করুণা করে
 ঘ. শূন্য নদীর তীরে
  রহিনু পড়ি
  যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

http://zoaddar.org

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বোকা বুড়োর গল্প শুনো
****
ছেলের হাত ধরে এগিয়ে চলে
দূরের পাহাড়টাকে একাই কাস্তেহাতে
করে দিতে সাফ
উত্তরে হাওয়া আনে হিম ঝড়
ছোট্ট ছেলের মনে পড়ে যায় ঘর
****
একদিন গ্রামবাসী দেখল এসে
বিরাট পাহাড় গেছে ধুলোয় মিশে
সেখানে দিয়েছে দেখা এক সরোবর
কত পাখি গান গায় তীরে বসে
বোকা বুড়ো, মরে পড়ে আছে সেখানে
পাখিরা গাইছে তার শেখানো সেই গান
We shall over come.

ক. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. 'সোনার তরী' কবিতায় বহু জায়গায় দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. অনুচ্ছেদের হিম ঝড়ের সঙ্গে 'সোনার তরী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরণের ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদটিতে 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব ফুটে উঠেছে—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

২।

চিত্রকর্ম : মোনালিসা (১৫০৩-১৫০৬)

শিল্পী : লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১০)
ছবিটি সারা বিশ্বে আজও সমান জনপ্রিয়।

ক. 'খরপরশা' শব্দের অর্থ কী?
খ. "চারিদিকে বাঁকা জল" – এর মাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পরিস্থিতি – ব্যাখ্যা কর।
গ. "যেয়ো যেথা যেথে চাও যারে খুশি তারে দাও " – এর আলোকে অনুচ্ছেদটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটিতে 'সোনার তরী' কবিতার ধানের সঙ্গে তুলনা করা কতটা যুক্তিযুক্ত—ব্যাখ্যা কর।

জীবন-বন্দনা

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে, ১৩০৬ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমান ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীর বাঙালির পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি'র মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'বিয়ের বাঁশি', 'ছায়ানট', 'প্রলয়-শিখা', 'চক্রবাক', 'সিন্ধু-হিন্দোল' বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'শিউলিমালা', 'মৃত্যু-ক্ষুধা', ইত্যাদি তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস। 'যুগ-বাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্র-মঙ্গল' ও 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' তাঁর উলেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

গাহি তাহাদের গান–
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।

শ্রম-কিণাঙ্ক–কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্ত ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।
এলো দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণী-মেরীর যীশু-
যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মতো ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে!

খেয়াল-খুশিতে কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুন চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু–অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মরু-কবি-গাহি সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপদ-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্র সুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোন বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডূক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

শব্দার্থ ও টীকা

ফরমান	-	বাণী, সংবাদ, খবর।
কিণাঙ্ক	-	ঘর্ষণের ফলে হাত বা পায়ের শক্ত হওয়া চামড়া বা মাংস, কড়া।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন	-	পরিশ্রম কড়া-পড়া ও দৃঢ়।
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান	-	যারা পৃথিবীর হাতে ফসলের খবর তুলে দিল। অর্থাৎ কবি সেই সব কৃষকের জয়গান গাইছেন যারা মাটির বুকে ফসল ফলায়।
এস্ত ধরণী নজরানা দেয়	-	কৃষকের দৃঢ় কঠিন হাতের কবলে পড়ে পৃথিবীর মাটি যেন ফুলে, ফলে ও ফসলের উপঢৌকন দিতে বাধ্য হয়।
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল	-	হিংস্র মাংসাশী জীবজন্তুর পরিপূর্ণ।
জরা-মৃত্যু-ভীষণ ধরা	-	বার্ধক্য ও মৃত্যু সমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর পৃথিবী।

যাদের শাসনে হল সুন্দর
কুসুমিতা মনোহরা - যে সব শ্রমনিষ্ঠ মেহনতি মানুষের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে পৃথিবী অনুপম সুন্দর, পুষ্পময় ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে, কবি তাদের জয়গান গাইছেন।

বর্বর - সভ্যতা বিকাশের আগেকার আদিম সভ্যতা জাতি, আদি মানব।

অকুতোভয়ে - নির্ভয়ে, নির্ভীকচিত্তে।

বিবর - গর্ত, গহ্বর।

যাযাবর - কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই এখন ভ্রাম্যমাণ জাতিবিশেষ।

ধরণী- মেরীর যীশু - পৃথিবী-মাতার আত্মোৎসর্গকারী পুত্র। মা মেরীর সন্তান যীশুখ্রিস্ট যেমন মানব-মঙ্গলের জন্য আত্মাহুতি দেন তেমনি যেসব মানবসন্তান মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করেন কবি তাদের বন্দনা করেন।

যাহাদের চলা লেগে উল্কার
মতো ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত
বেগে - মহাবিশ্বে পৃথিবী প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। কবি কল্পনা করছেন যাঁরা স্থবিরতার বিরুদ্ধে, চলার গতিতে যারা আস্থাবান তাদের চলার গতিতেই যেন পৃথিবীর এই গতি।

অমরাবতী - স্বর্গ।

যাহারা করিল ধ্বংস
সাধন পুন চঞ্চলমতি - অস্থির আবেগের বশে যারা পুনরায় ধ্বংস করেছে।

উদ্ধত-শির - যারা সহজে মাথা নোয়ায় না, দুর্বিনীত।

গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর - সাগর ভরাট বা নিয়ন্ত্রণ করে নগর-বন্দর প্রতিষ্ঠা করতে গেল।

যারা জীবনের পসরা বহিয়া
মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি - যারা প্রাণের মায়া করে না, মৃত্যুকে পরোয়া করে না।

ভীম রণভূমে - ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রে।

বেদে - ভারতবর্ষ অঞ্চলের যাযাবর জাতিবিশেষ।

বেদুঈন - আরব দেশের যাযাবর জাতিবিশেষ।

গরল-পিয়ালা - বিষপাত্র।

গিরি-নিঃস্রাব - পর্বত-নিঃসৃত ঝর্ণা বা নদী।

আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব বর্বর বলি যাহাদের গালি	-	বর্ষাকালে নদী বা ঝর্ণার জলস্রোত প্রচণ্ড গতিশক্তি পায়।
পাড়িল ক্ষুদ্রমনা	-	সংকীর্ণচিত্ত লোকেরা যেসব কৃষক, মজুরদের অসভ্য, অশিক্ষিত বলে গালাগালি দিয়েছে তাদের।
কূপমণ্ডূক	-	কুয়োর ব্যাঙ, বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তি, অল্পজ্ঞ।
অসংযমী	-	উচ্ছৃঙ্খল।
কূপ-মণ্ডূক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে	-	যাকে অল্পজ্ঞান ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে 'উচ্ছৃঙ্খল' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ছন্দ

'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত। শেষ অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রার। নজরুলের একটি প্রিয় ছন্দ এই ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। তাঁর বহুকবিতা এই ছন্দে রচিত।

উৎস ও পরিচিতি

'জীবন-বন্দনা' কবিতাটি নজরুলের 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

যুগের যথার্থ চারণকবি নজরুলের কবিতায় সমকালে মানবমুক্তির যে উদাত্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল 'জীবন - বন্দনা' কবিতাতেও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে। এ কবিতায় কবি তাদের জয়গান গাইছেন যারা কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয় ফল ও ফসল, যারা মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে করে তুলেছে মনোরম ও সুন্দর, যারা মানব-কল্যাণে আত্মাহুতি দিয়েছে দেশে দেশে কালে কালে।

কবি তারুণ্যের সেই শক্তিকে বন্দনা করেন যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত জয় করে, সাগরকে ভরাট করে নগর গড়ে, মেরুর বুকে অভিযান চালায়, আকাশ জয়ে ছুটে যায় গ্রহ গ্রহান্তরে।

কবি মানবের মুক্তিসংগ্রামে আগুয়ান সেই শক্তির জয়গান গান, যারা মানবমুক্তির পথে কোনো বাধা মানে না। নির্দ্বিধায় আত্মাহুতি দেয় বিপদ্ধী সংগ্রামে।

সংকীর্ণমনার দল এদের উচ্ছৃঙ্খল বলে আখ্যা দিলেও কবির কাছে এদের মহিমা অসীম। তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে এদেরই জয়গান রচনা করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

ভাষা অনুশীলন ❑ বানান সতর্কতা

ধরণী, কিণাঙ্ক, শ্বাপদ, ভীষণ, ফণী, অরণ্য, ধ্বংস, নবীন, উর্ধ্ব, রণভূমি, আষাঢ়, নিঃস্রাব, কূপমণ্ডূক।

চলিত গদ্যরূপ

লয়ে - নিয়ে

বুঝিতে - বোধ করতে

শুষিতে - শোষণ করতে

যারে - যাকে

তারে - তাকে।

বিশিষ্টার্থক শব্দ

কূপমণ্ডূক - আভিধানিক অর্থ - কুয়োর ব্যাঙ।

অলংকারিক অর্থ - সংকীর্ণমনা ব্যক্তি, বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তি।

☐ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?
   ক. কিনাংক   খ. কিণাংক
   গ. কিনাঙ্ক   ঘ. কিণাঙ্ক

২. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'ত্রস্ত্মধরণী' বলতে পৃথিবীর কোন রূপকে বোঝানো হয়েছে?
   ক. ভীতা   খ. ভয়ংকরা
   গ. অকর্ষিতা   ঘ. অনুগতা

কবিতাংশটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কঠিন শীতল মরণসাগর মন্থন করে যারা
অমৃত আনিয়া উপহার দিল নিজেরে করিয়া সারা।

৩. কবিতাংশটি 'অমৃত' শব্দের সঙ্গে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন শব্দটির ভাবার্থের মিল রয়েছে?
   ক. জীবনের পসরা   খ. উগ্রসুখ
   গ. নজরানা   ঘ. জীবনের উলাস্ন

৪. নিচের কোন চরণ দুটিতে কবিতাংশটির ভাবের সঙ্গতি রয়েছে?
   ক. জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
   সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
   খ. যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
   করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
   গ. শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
   ত্রস্ত্মধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
   ঘ. তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উলাস্নসে
   চলছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহ স্বর্গে অসীমাকাশে।

http://zoaddar.org

৫. 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় 'অসংযমী' অ্যাখ্যাটি যাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারা–

i. বাধাহীন জীবনে অভ্যস্ড়

ii. জীবন উলাসে ভরপুর

iii. দুর্বলচিত্তের অধিকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii

গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তোমার প্রণাম করি জুড়ি দুই কর
বন্ধ্যা পৃথিবী আবাদ করলে বজ্রমুষ্টিধর
দুপায়ে ঝড়ের গতি ছুটিছ উধাও
গ্রহ থেকে গ্রহান্ড্রে দলি নীহারিকা।
পুষিলে সাগর তুমি, মরুকে রসালে
গড়িতে আবাসভূমি পর্বত উড়ালে।

ক. যীশু কে?

খ. 'কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বর্ণনা কর।

গ. কবিতাংশটির প্রথম চরণদুটিতে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতাংশটিতে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার মর্মবাণীই প্রতিফলিত হয়েছে–মন্ড্ব্যটি যাচাই কর।

২।

স্তবক-১: রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে
ভিজে দিবা-রাতি
মোদের ক্ষুধার অন্ন যোগায়
চায় নাক সে খ্যাতি।

স্তবক-২: দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয় করে জয়
তাহাদের পরিচয়
লিখে রাখে মহাকাল
সব যুগে যুগে সবকালে টিকা ভাস্করে শোভে ভাল।

ক. 'কূপমন্ডূক' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

খ. 'আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? বর্ণনা কর।

গ. 'জীবন বন্দনা' কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী, স্তবক ১-এ উলিস্নখিত ব্যক্তিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'জীবন বন্দনা' কবিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী, স্তবক ২-এর বক্তব্য স্তবক ১-এর উলিস্নখিতদের জন্য প্রযোজ্য কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

বাংলাদেশ

অমিয় চক্রবর্তী

কবি-পরিচিতি

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী এক সময় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব। তিনি লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছিলেন অক্সফোর্ডে। তিন দশক কাটিয়েছেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। এদিক থেকে এক বিশ্ব নাগরিক মননের অধিকারী তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সব সময় অবিচ্ছেদ্য। এক সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব হিসেবে তাঁর প্রজন্মের অন্য সব কবির তুলনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ছিলেন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু নবীন্দ্রনাথের পথানুসারী তিনি হন নি। এমনকি তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'খসড়া' রবীন্দ্রপ্রভাববর্জিত আধুনিকতার অনন্য বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে 'একমুঠো', 'মাটির দেয়াল'. 'অভিজ্ঞানবসন্ড়' 'পারাপার', 'পালাবদল', 'পুষ্পিত ইমেজ', 'অমরাবতী, 'ঘরে ফেরার দিন' ও 'অনিঃশেষ'। তাঁর 'পারাপার' ও 'পালাবদল' কাব্যের পটভূমি চার মহাদেশ-পরিব্যাপ্ত। অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলির শ্রীরামপুরে। তাঁর মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে।

কল্যাণীর ধারাবাহী যে– মাধুরী বাংলা ভাষায়
গড়েছে আত্মীয় পল্লীঢ় যমুনা-পদ্মার তীরে তীরে
রুপোলি জলের ধারে, আম-জাম-নারকেল ঘেরা
আমন ধানের খেতে শ্রান্তিময় তারি অন্তর্লীন
বাণী শোনো প্রাত্যহিক-বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে
সেই বাংলাদেশে ছিল সহস্রের একটি কাহিনী
কোরানে পুরাণে শিল্পে, পালা-পার্বণের ঢাকে ঢোলে
আউল বাউল নাচে; পুণ্যাহের সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশতলে দেখ কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে, খড়ে–ছাওয়া ঘরের আঙনে
মাঠে ঘাটে-শ্রমসঙ্গী নানাজাতি ধর্মের বসতি
চিরদিন বাংলাদেশ–

ওরা কারা বুনো দল ঢোকে
এরি মধ্যে (থামাও, থামাও), স্বর্ণশ্যাম বুক ছিড়ে
অস্ত্র হাতে নামে সান্ত্রী কাপুরুষ, অধম রাষ্ট্রের

রক্ত পতাকা তোলে, কোটি মানুষের সমবায়ী
সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে, মরুপশু
মারীর অন্ধতা ঝড়ে হানে অসহায় নরনারী
অলভ্য জয়ের লোভে, জ্বালায় শহর, গ্রামে গ্রামে
প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নস্তূপে দূরের উলুক
বাঁধে কেলাচ় (পারবে না, পারবে না,) পাপাশ্রয়ী পরজীবী
যতই লুণ্ঠন করে শস্য পাট পণ্য, ঘরে ঘরে
ছড়ায় অমেয় শোক, ধর্মনাশ হত্যার ছায়ায়
ঘেরে আর্ত গৃহস্থালি, চতুর্গুণ হিন্দু মুসলমান
বাংলার বাঙালি তত জানে জন্মমৃত্যুর বন্ধনে
অভিন্ন আপন সত্তা,

লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত
ঘৃণ্য যম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্তদ্বারে ছোটে,
পথে পথে অনশনে অন্তিম যন্ত্রণা রোগে ত্রাসে
সহস্রের অবসান, হন্তারক বারুদে বন্দুকে
মূর্ছিত-মৃতের দেহ বিদ্ধ করে, হত্যা-ব্যবসায়ী
বাংলাদেশ-ধ্বংস-কাব্যে জানে না পৌঁছল জাহান্নামে
এ জন্যেই;
বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে ॥

শব্দার্থ ও টীকা

কল্যাণী	-	মঙ্গলময়ী, শুভদায়িনী।
ধারাবাহী	-	অবিচ্ছিন্ন।
গড়েছে আত্মীয় পলীট	-	এককালে বাংলাদেশের গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। নানা সম্প্রদায়ের বসতি সেসব গ্রামকে অভিন্ন আত্মিক বন্ধনে বেঁধেছে বাংলা ভাষা।
শ্রান্তিময় তারি অন্তর্লীন বাণী	-	আবহমান বাংলাদেশের জনগণের অন্তরের সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়া মর্মবাণী হচ্ছে সম্প্রীতি ও শুভবোধ।
বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে	-	বহুকাল ধরে বহু জাতির বিভিন্ন ও বিচিত্র জনস্রোত এসে মিশেছে বাংলার মাটিতে। ঐ জনবৈচিত্রের বহুমুখী সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। এ জাতি গঠনের মূল উপাদান এসেছে ইন্দো-ভূমধ্য নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতি। তার সঙ্গে মিশেছে দ্রাবিড় (মেলানাইড), ভেড্ডিড (প্রোটো অস্ট্রোলয়েড) ও কিছুটা মঙ্গোলীয় রক্ত। আমাদের জাতিত্বে, সংস্কৃতিতে, ভাষায়, আচার-আচরণে, ধর্মবোধ

ও বিশ্বাসে এসব জনগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়:

ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত
যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর-
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

সহস্রের একটি কাহিনী - অজস্র বৈচিত্র্য নিয়ে গড়া ঐক্য।

পুণ্যাহ - কর্ম অনুষ্ঠানের শুভ বা পবিত্র দিন। শুভ দিনে বছরের খাজনা আদায় আরম্ভ অনুষ্ঠান।

ওরা কারা বুনো দল ঢোকে - ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হামলার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা হয়েছে।

স্বর্ণশ্যাম - সোনালি-শ্যামল।

সাত্রী কাপুরুষ - পাকিস্তানি সেনাদের ভীরু বলা হয়েছে, কারণ নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে তারা সর্বাধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা করেছিল।

অধম রাষ্ট্র - কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনমূলক এবং গণবিরোধী ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

রক্ত পতাকা তোলে - জনগণের রক্তরঞ্জিত পাকিস্তানি পতাকাকে উত্তোলন করে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী।

কোটি মানুষের সমবায়ী সভ্যতার ভাষা - বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার জন্যে হানাদার তাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল অস্ত্রের জোরে।

মরু-পশু মারীর অন্ধতা ঝড়ে হানে - পাকিস্তানের মরু অঞ্চল থেকে আগত পশুসৈন্যেরা অজস্র মৃত্যুর ধ্বংসলীলা সৃষ্টির জন্য প্রচণ্ড আঘাত হানে।

অলভ্য জয়ের লোভে - বাস্তবে বাংলাদেশে তাদের জয় লাভ ছিল দুরাশা। কিন্তু প্রচণ্ড লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তারা দখলদারি বজায় রাখতে হত্যাযজ্ঞের অন্যায় পথ বেছে নিয়েছিল।

গ্রামে গ্রামে প্রাচীন সংহতি ভেঙে - পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আবহমান গ্রাম-বাংলার শান্তসংহত জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

আর্ত গৃহস্থালি	-	পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে প্রতিটি পরিবার বিপন্ন হয়। হয় স্বজনহারা। মৃত্যুর আতঙ্কের মুখে সদা সন্ত্রস্ত হয় পারিবারিক জীবন।
চতুর্গুণ হিন্দু-মুসলমান	-	বাংলাদেশের বাঙালির ওপর আক্রমণ চললে সারা বিশ্বের বাঙালি হিন্দু মুসলমান তাদের পাশে সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। সংহতি প্রকাশ করে স্বাধীনতার ন্যায্য দাবির সঙ্গে।
হা-ঘরে	-	গৃহহীন, উদ্বাস্তু
হন্তারক	-	হত্যাকারী।
বাংলাদেশ-ধ্বংস-কাব্যে জানে না পৌঁছল জাহান্নামে এ জন্মেই	-	হত্যাকারীরা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে বাংলাদেশে ধ্বংসের কাহিনীকাব্য রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা জানে নি যে তারা আসলে নিজেদের নিয়ে যাচ্ছিল জাহান্নামে।
বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে	-	ধ্বংস, মৃত্যু, রক্ত, অশ্রুর মধ্য দিয়ে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উৎস ও পরিচিতি

অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' কবিতাটি তাঁর 'অনিঃশেষ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। দীর্ঘ কবিতাটির কেবল প্রথমাংশ সংকলিত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কবিতাটি রচিত। বাংলা ভাষার হাজার বছরের মাধুরী, রূপালি নদীবিধৌত বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য-স্নিগ্ধ অজস্র পল্লীএবং কুরআন-পুরাণ-পালাপার্বনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানা ঐতিহ্যময় জনজীবনে যে নারকীয় বিভীষিকা সৃষ্টি করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণে, তারই ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ কবিতার ক্যনভাসে। অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বাঙালিকে দমাতে পারে নি তারা, পারে নি তার সত্তাকে বিভক্ত করতে। ফলে ধ্বংস- মৃত্যু-আর্তনাদের ভেতর দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অনন্ত অক্ষয়মূর্তি।

ছন্দ

কবিতাটি ১৮ মাত্রার প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে দুটি পর্ব ৮ + ১০।

অনুশীলনমূলক কাজ

কবিতা উপলব্ধি

১. এ কবিতাটির প্রথম স্বাবকের ভাববস্তুতে ফুটে উঠেছে আবহমান বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, রূপময় প্রকৃতি, অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জনজীবন। স্তবকের শেষ এ লাইনটিতে তারই অনুরণন-'চিরদিন বাংলাদেশ'। [দ্বিতীয় স্তবক (১৩ থেকে ২৬ লাইন)]

২. কবিতাটির স্তবক শুরু হয়েছে নাটকীয় আকস্মিকতায়- 'ওরা কারা বুনো দল ঢোকে' ইত্যাদি দিয়ে । এ অংশে প্রধান হয়ে উঠেছে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন,হত্যাকা, নির্যাতন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনজীবনকে তছনছ করার ছবি। কিন্তু এ স্তবক শেষ হয়েছে বাঙালির অপরাজেয়তার ইশারায়।

৩. তৃতীয় স্তবক হানাদার বাহিনীর হত্যাকা'র প্রতিক্রিয়া। লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করে, অজস্র মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা ঘটিয়ে হানাদার বাহিনী শেষ পর্যন্ত নিজেরাই পৌঁছল জাহান্নামে।

৪. চতুর্থ স্তবক মাত্র একটি উজ্জ্বল অনির্বাণ লাইন এবং তা যেন সমস্ত ধ্বংস, হত্যা, মৃত্যুকে ছাপিয়ে উঠেছে: 'বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষয় মূর্তি জাগে'।

ভাষা অনুশীলন

বিসর্গসন্ধি ❑ একটি দিক

বিসর্গযুক্ত ই বা উ ধ্বনির পর 'গ' বা 'দ' থাকলে বিসর্গ রেফ হয়ে যায়। যেমন:

দুঃ + গত = দুর্গত
দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা
চতুঃ + গুণ = চতুর্গুণ
চতুৎ + দিন = চতুর্দিক
নিঃ + গত = নির্গত
নিঃ + দেশ = নির্দেশ
নিঃ + দোষ = নির্দোষ

বানান: ঈ-কারান্ত পরপদ

'বাংলাদেশ' কবিতায় ব্যবহৃত 'ধারাবাহী' ও 'পরাজীবী' শব্দ দুটি লক্ষ কর। শব্দ দুটি গঠিত হয়েছে '–বাহী' ও '–জীবী' পরপদ যোগে। এ ধরনের ঈ-কারান্ত পরপদ থাকলে শব্দের শেষে বানানে স্বভাবতই ঈ-কার হয়। যেমন: বাহী: ক্ষণজীবী, দীর্ঘজীবী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, মৎস্যজীবী, শ্রমজীবী।

বানান সতর্কতা

আত্মীয়, কল্যাণী, মাধুরী, তীর, অন্তর্লীন, বাণী, পলীঢ় পার্বণ, পূণ্যাহ, সঙ্গী, স্বর্ণশ্যাম, সান্ত্রী, মারী, প্রাচীন, পরাশ্রমী, পরজীবী, পণ্য, গৃহস্থালি, সীমান্তযন্ত্রণা, মূর্ছিত, স্তূপ, যমধূত, ধ্বংস, মূর্তি।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাংলাদেশ' কবিতায় অস্ত্র হাতে কারা নামে?

ক. কোটি মানুষ খ. সান্ত্রী কাপুরুষ
গ. হিন্দু মুসলমান ঘ. হত্যা ব্যবসায়ী

২. 'বুনোদল' কারা?

ক. পাকিস্তানি সৈন্য
খ. হিংস্র বন্য পশু
গ. বর্বর মারাঠা
ঘ. বেনিয়া ইংরেজ

৩. 'পালা পার্বণে ঢাকে ঢোলে আউল বাউল নাচে'– চরণের মধ্যে বাংলাদেশের কোন রূপ প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. অসাম্প্রদায়িক
খ. সাংস্কৃতিক
গ. প্রাকৃতিক
ঘ. আঞ্চলিক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

গ্রামের নাম রতনপুর। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। এখানে মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টানদের বাস। এরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তারা যেন একই সূত্রে গাঁথা।

৪. **অনুচ্ছেদের সাথে 'বাংলাদেশ' কবিতার কোন চরণের মিল আছে?**

ক. বাণী শোনে প্রাত্যহিক-বহুমিশ্র প্রাণের সংসারে
খ. মাঠে ঘাটে-শ্রমসঙ্গী নানাজাতি নানা ধর্মের বসতি
গ. কোটি মানুষের সমবায়ী সভ্যতার ভাষা
ঘ. খেয়ে আর্ত গৃহস্থালি, চতুর্গুণ হিন্দু মুসলমান

৫. **উল্লিখিত চরণ এবং অনুচ্ছেদে বাঙালির যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তা হল–**

i. সম্প্রীতি
ii. অসাম্প্রদায়িকতা
iii. শ্রম বৈচিত্র্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. খালের পাড় দিয়ে হাঁটছিল দীনু। ঠিক তখনি মিলিটারির মধ্যে একজন তার নিশানা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য খালের ওপার থেকে দীনুকে তাক করে। আস্তেড়ীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীনু। চোখ দুটো ভীষণ টানছিল তার। তখুনি দৃশ্যটা দেখতে পায় ও, তার বুকের রক্তে তৈরি হয়েছে বিশাল লম্বা এক খাল। সেই খাল বেয়ে ফিরে আসছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিটি নৌকা থেকে ভেসে আসছে উলাসের শব্দ। দেখে দীনুর যে কী খুশি। তা হলে এই কি স্বাধীনতা! দীনুর ঠোঁটে বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো এক টুকরো হাসি ফুটে ছিল। কেউ তা দেখে নি।

ক. 'বাংলাদেশ' কবিতায় প্রতি চরণে কয়টি পর্ব?

খ. 'বহু মিশ্র প্রাণের সংসারে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. দীনুর স্বপ্নে 'বাংলাদেশ' কবিতার কোন পঙ্‌ক্তির ভাবার্থ ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ কবিতার বিষয়বস্তুর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে' মন্তব্যটি যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ কর।

২. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েলে পাখি–
****
বাংলার নগর বন্দর গঞ্জ বাষট্টি হাজার গ্রাম
ধ্বংস স্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে।

ক. 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

খ. 'অভিন্ন আপন সত্তা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুচ্ছেদে প্রথম স্তবকের সাথে 'বাংলাদেশ' কবিতার প্রথম স্তবকের কোন বিষয়ে মিল আছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদটি 'বাংলাদেশ' কবিতার অনেকটাই প্রতিফলন – এ বক্তব্যটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।

http://zoaddar.org

কবর

জসীমউদ্‌দীন

কবি-পরিচিতি

বাংলা সাহিত্য জসীমউদ্‌দীনের সাধারণ পরিচয়- তিনি 'পল্লীকবি'। বস্তুত বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ সরল প্রাকৃতিক রূপ উপযুক্ত শব্দ, উপমা ও চিত্রের মাধ্যমে তাঁর কাব্যে যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে তেমনি আর কারও কবিতায় সামগ্রিকভাবে দেখা যায় না।

জসীমউদ্‌দীনের কবিপ্রতিভা উন্মেষ ঘটেছিল ছাত্রজীবনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই তাঁর 'কবর' কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফলে ঐ সময়েই তিনি দেশব্যাপী কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কর্মজীবনের শুরুতে জসীমউদ্‌দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হন। জসীমউদ্‌দীনের বিখ্যাত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য জনপ্রিয় ও সমাদৃত গ্রন্থ হচ্ছেঃ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'বালুচর', 'ধানখেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। এছাড়াও তিনি স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

কর্মকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত করেছে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি দিয়ে।

জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে। তাঁর মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায়।

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালি উষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা
"আমারে দেখিতে যাইও কিন্তুউজান-তলীর গাঁ।"

শাপলার হাটে তরমুজ বেচি ছ পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে।
হেস না-হেস না-শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, "এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।"
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, "আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদির তরেতে যেন গো ভেস্‌ড়সিব হয়।"

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়-আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস্ তুই? কী করিব দাদু! পরান যে মানে না।
সেই ফাল্‌গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
"বা-জান, আমার শরীর আজিকে কী যে করে থাকি থাকি।"
ঘরের মেঝেতে সপ্‌টি বিছায়ে কহিলাম বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা "বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?"
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!

তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো-মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।

উদাসিনী সেই পলীবালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, "বাছারে যাই,
বড় ব্যথা র'ল, দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।"
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গ ভিজায়ে নয়ন-জলে,
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল– "আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথালখানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।"
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরানের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়ামানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকি-মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, "রহমান খোদা! আয়;
ভেস্ড়াসিব করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়!"

এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।
এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, "দাদু যেন কাল এসে
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।"
শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয় রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরানে বাজিবে মরণ-বীণ!
কী জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ-দাদু! "আয় খোদা! দয়াময়।
আমার বু-জীর তরেতে যেন গো ভেস্ড়াসিব হয়।"

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্কে দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কী জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা!

ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদির ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁঝেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে।
কী জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গেছে।
আপন হস্ডেসানার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু! ধর-ধর-বুক ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি।

এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা কস নাকো, জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্ড়েআস্ড়েখুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে,
দীনদুনিয়ার ভেস্ড়আমার ঘুমায় কিসের ছলে!
* * * * * * * * * * * * * * * *
ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মজিদ হইতে আযান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা! রহমান।
ভেস্ড়াসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ।"

শব্দার্থ ও টীকা

তিরিশ বছর ভিজায়ে
রেখেছি দুই নয়নের জলে - ত্রিশ বছর আগে বৃদ্ধের স্ত্রীর (অর্থাৎ পৌত্রের দাদির) মৃত্যু হয়েছে। ত্রিশ বছর ধরে শোকার্ত বৃদ্ধের বেদনাশ্রুতে এই কবর নিয়ত সিক্ত হয়েছে।

সোনার মতন মুখ - সোনার মতো লাবণ্য ঝলমল মুখ।

পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে
কেঁদে ভাসাইত বুক - ছোট মেয়েটির আনন্দময় খেলা ছিল পুতুলের বিয়ে দেয়া। কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার সে আনন্দ হারিয়ে মেয়েটি মনের দুঃখে কাঁদত। এ দেশে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল তারই ইঙ্গিত।

সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর

ছড়াইয়া দিল কারা	-	সেই লাবণ্যময়ী মেয়েটি যখন কর্মচঞ্চল হয়ে বাড়ির সর্বত্রও বিচরণ করত তখন সেই তরুণ বয়সে বৃদ্ধ মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবতেন, গোটা বাড়িটা কারা যেন অজস্য সোনায় ভরিয়ে দিয়েছে।
সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি	-	মেয়েটির সেই কনকলাবণ্যে ভরা মুখ চোখ ভেবে ভেবে।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত	-	কৃষি ক্ষেত্রে যাওয়ার সময়ে তাকে বার বার ফিরে ফিরে দেখেও যখন দেখার সাধ মিটত না। তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ : 'জুনম অবধি হাম রূপ নেহারিলু নয়ন না তিরপিত ভেল।'
দু পয়সা করি দেড়ী	-	দু পয়সাকে দেড়গুণ (তিন পয়সা) করে অর্থাৎ ভালরকম লাভ করে।
'দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন.... 'সেই তামাক মাজন পেয়ে, দাদি যে তোমার কত খুশি হত'	-	লৌকিক আচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মতো এ দেশেও মেয়েদের মধ্যে তামাক খাওয়ার রীতি যে প্রচলিত ছিল তারই ইঙ্গিত। মেয়েরা দাঁতে মিশি হিসেবেও তামাক ব্যবহার করত।
বাট	-	পথ, রাস্তা।
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার	-	আমার সঙ্গে সামান্য বিচ্ছেদে যার বেদনার অন্ত থাকত না।
তরেতে	-	জন্য।
ভেস্তনসিব হয়	-	ভাগ্যে যেন বেহেশতের সুখ লাভ ঘটে। 'বেহেশত' শব্দের বিকৃত রূপ- ভেস্ত
তারপর এই শূন্য জীবনে	-	স্ত্রীর মৃত্যুতে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাওয়া জীবনে।
শত কাফনের, শত কবরের অঙ্গ হৃদয়ে আঁকি	-	মনের পর্দায় অগণিত মৃত্যুর হিসাব কষে।
নাওয়ায়ে চোখের জলে	-	প্রিয়পাত্রদের শেষ গোসল যেন চোখের জলেই সমাধা করা হয়েছিল।
মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি	-	বৃদ্ধ কৃষক বলে যে মাটিতে ফসল ফলে সেই মাটির প্রতি তার মমতা অপরিসীম। কিন্তু সেই মমতা আরও গভীর হয়েছে মাটিতে কবরের মধ্যে তার বেশ কয়েকজন প্রিয়পাত্র শায়িত বলে।
কাঁদছিস তুই? কী করিব দাদু! পরান যে মানে না	-	নাতিটির বাবা ও মায়ের কবরের উল্লেখ করায় নাতির চোখ জলে ভরে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধের মনে যে বিপুল দুঃখ-বেদনার ভার জমেছে সে দুঃখ-বেদনার কিছুটা না বলতে পারলে যে বেদনা-ভার লাঘব হবে না।
বা-জান	-	'বাপজান' শব্দের সংক্ষিপ্ত আঞ্চলিক রূপ। পিতা।

কী যে করে থাকি থাকি - অব্যক্ত ব্যথায় মন মোচর দিয়ে ওঠে বার বার।

ছপ, সপ্ - পাটি, চাটাই।

তুমি যে কহিলা, 'বা-জানরে মোর
কোথা যাও দাদু লয়ে?" - নাতি তখনও মৃত্যুর সঙ্গে অপরিচিত। তাই সে বুঝতে পারেনি যে তার বাবাকে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তোমার কথার উত্তর দিতে
কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত কথা আছে
কেঁদে ফিরে গেল দুখে! - পিতাকে যে কবরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে কথা বলা সম্ভব ছিল না বলে বৃদ্ধ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে দুঃখের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ দেয়ার মতো শব্দ যেন হারিয়ে গিয়েছিল সারা দুনিয়ার শব্দ ভান্ডার থেকে।

শুনো - শূন্য।

চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত
গাছের পাতার শোক - বৃদ্ধের পুত্রবধূর শোকার্ত কান্নায় ব্যথিত হয়ে পথচারী পথিকের পায়ের তলায় শুকনো ঝরা পাতারা যেন মর্মর ধ্বনিতে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠত। বনপথে পথিকের পায়ের তলায় দলিত শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি এখানে শোকধ্বনির ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

আথালে - গোয়ালে, গোশালায়।

সারা মাঠ পানে চাহি - বৃদ্ধের পুত্রের মৃত্যুতে হালের দুটি বলদও বেদনামথিত কান্নায় আকুল হয়েছে। ভাষাহারা বোবা প্রাণী দুটির সে বেদনা প্রকাশ পেত করুণ হাম্বা রবে আর অবিরত ঝরে পড়া চোখের পানিতে।

নাহি - স্নান করে।

গহীন - গহন শব্দের কাব্যিক রূপ। গভীর।

সায়র - সাগর শব্দের কাব্যিক রূপ। দিঘি, সরোবর।

চোখের জলের গহীন সায়রে
ডুবায়ে সকল গাঁ - পুত্রবধূর শোক এতই গভীর বেদনাবহ ছিল যে সেই শোকের সহানুভূতিতে সমস্ত গ্রামটিই যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত।

উদাসিনী সেই পল্লীবালার - স্বামীশোকে মেয়েটি (সেখানে পুত্রবধূ) সংসারের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল।

নয়নের জল বুঝি / কবর দেশের
আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি - স্বামীহারা শোকাকুল মেয়েটি অচিরেই মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছিল।
তাই জীবনের প্রথম বেলায়

ডাকিয়া আনিল সাঁঝ - শোকাহত মেয়েটি জীবনপ্রভাতেই জীবনসন্ধ্যারূপ মৃত্যুকে ডেকে আনল। অকালেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

তাজ - মুকুট, শিরোভূষণ।

অভাগিনী আপনি পরিল
মরণ-বিষের তাজ - ভাগ্যহত মেয়েটি যেন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিল। মৃত্যু বিষাক্ত মুকুটরূপে কল্পিত।

মরিবার কালে ...
ছাড়িয়া যাইতে তোরে - সন্তানবৎসল জননী শিশুপুত্রকে মাতৃহীন করে যেতে চান নি। কিন্তু স্বামীকে হারানোর দুঃখ তাকে এতই কাতর করে তুলেছিল যে, তিলে তিলে তিনি মৃত্যুকেই বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কী জানি আশিস করে গেল
তোরে মরণ-ব্যথার ছলে - মরণযন্ত্রণায় তার চোখে যে অশ্রুধারা নেমেছিল তা আসরে সন্তানের প্রতি বেদনামথিত আশীর্বাদ।

মাথাল - তালপাতা, গোলপাতা ও বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি বড় টুপি জাতীয় আচ্ছাদন, যা রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাষীরা ব্যবহার করে।

জোড়মানিকেরা - রত্নযুগল। এখানে পাশাপাশি কবরে শায়িত পুত্র ও পুত্রবধূকে বোঝানো হয়েছে। জোড়মানিক শব্দ ব্যবহারে চখা-চখির নিবিড় প্রণয়ের অনুষঙ্গটি জড়িত। চখা ও চখি সাধারণত একে অন্যের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না।

জোনাকী- মেয়েরা সারারাত
জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো - নিরাভরণ কবরে আলো জ্বালিয়ে রাখে রাতের জোনাকিরা।

রহমান - দয়াময়।

বুজি - বুবুজি, বড় বোন।

বনিয়াদি - প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত খানদানি ঐতিহ্য রয়েছে এমন।

শত যে মারিত ঠোঁটে - তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটু কথায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত।

কসাই চামার - কসাই ও চামারের মতো নির্মম, নিষ্ঠুর।

কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে
বাজিবে মরণ-বীণ - সেই মেয়েটির জীবনেও যে মৃত্যুর ডাক আসবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

ব্যথাতুর - বেদনার্ত।

বনের ঘুঘুরা উহু উহু
করি ... বেদনার বীণ - হতভাগিনী মেয়েটির দুঃখে কাতর হয়ে বনের ঘুঘুরা যেন হা-হুতাশ করে উদাস সুরে ডাকত আর গাছের পাতারা যেন কেঁপে উঠত বেদনার মর্মর ধ্বনিতে।

রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল

ভেস্তেক্ষ দ্বার বেয়ে	-	বৃদ্ধের কনিষ্ঠা কন্যাটির জন্ম হয়েছিল স্বর্গীয় সুষমা ও সৌন্দর্য নিয়ে।
তোমার দাদির মুখখানি মোর হৃদয়ে উঠিত ছেয়ে	-	কনিষ্ঠা কন্যাটির চেহারা ছিল অবিকল বৃদ্ধের স্ত্রীর মতো। তাই তাকে দেখলেই বৃদ্ধের অন্তরে প্রয়াত স্ত্রীর চেহারাটুকু ভেসে উঠত।
রঙিন সাঝেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা	-	চমৎকার চিত্রকর এটি। বৃদ্ধ তার ছোট কন্যাকে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীর কথা স্মরণ করে অঝোরে কাঁদতে শুরু করলে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে আসত।
দাদু! ধর-ধর-বুক ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি	-	শোকের ঘটনাগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বৃদ্ধ যেন মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পড়েন।
দীন-দুনিয়ার ভেস্ত্ড়	-	ইহকাল ও পরকালের স্বর্গ, অর্থাৎ ইহজীবন ও পরজীবনের সর্বসুখের আকর।
দীন-দুনিয়ার ভেস্ত্আমার ঘুমায় কিসের ছলে!	-	পার্থিব জগতে যে বেহেশতের সৌন্দর্যসুষমা নিয়ে এসেছিল সে কোন লীলাচ্ছলে এ কবরে ঘুমিয়ে পড়েছে।
ঘন আবিরের রাগে	-	দূর বনের মাথায় আসন্ন সন্ধ্যাকাশ আবিরের মতো লাল আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে।
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে	-	স্ত্রী পুত্র কন্যা যে কবরে শুয়ে আছে সেখানে তাদের কাছে যেত।
মজিদ	-	মসজিদ।
রোজ কেয়ামত	-	পৃথিবীর পরিসমাপ্তি দিন। মহাপ্রলয়।
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কতদূর	-	বৃদ্ধ তাঁর জীবনের শেষ দিনটির জন্য আকুল হয়ে পরীক্ষা করছেন। মানুষ নিজের জীবনের শেষ কবে তা জানে না।

উৎস ও পরিচিতি

'কবর' জসীমউদ্‌দীনের বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত কবিতা। এটি প্রথম যখন 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ ক্লাসের ছাত্র। এ কবিতায় কবি জসীমউদ্‌দীনের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিতাটিকে প্রবেশিকা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীকালে কবিতাটি কবির 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।

করুণ রসাত্মক এ কবিতায় প্রধান হয়ে উঠেছে এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের গভীর বেদনাগাঁথা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ তার জীবনের শোকার্ত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করেছেন তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে। গোরস্থানে গিয়ে নাতিকে তিনি এক এক করে তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যার কবর দেখিয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে বর্ণনা করেছেন তাদের মৃত্যুর মর্মান্তিক স্মৃতিগুলো। যে অনেক মৃত্যুবেদনায় তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত সেই হৃদয় থেকে আজ উৎসারিত হচ্ছে চোখের জলে বুক ভাসানো হাহাকার।

বৃদ্ধ দাদুর করুণ স্মৃতিময় শোক- বেদনাই কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছন্দ

কবিতাটি যান্ত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতিটি চরণে ৩টি পূর্ণ পর্ব এবং ১টি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। পূর্ণ পর্বের মাত্রা ৬ এবং অপূর্ণ পর্বের মাত্রা ২। প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা মোট ২০। দু, একটি চরণে শেষ অপূর্ণ পর্ব ১ মাত্রার। যেমন: 'বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা/আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।'

অনুশীলনমূলক কাজ

বানান ☐ সাধু ভাষায় 'ঙ্গ' এর স্থানে চলিত ভাষায়-'ঙ'

সাধু ভাষায় ব্যবহৃত কিছু শব্দের বানানে 'ঙ্গ'-এর জায়গায় চলিত ভাষায় কোমল রূপ হিসেবে বানানে 'ঙ' হয়। যেমন:

ভেঙ্গে	: ভেঙ্গে। 'কবর' কবিতায় ব্যবহৃত এমন কিছু শব্দের উদাহরণ।
ভেঙে	: পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
লাঙল	: লাঙল লাইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
রঙিন	: রঙিন সাঁঝেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

সমোচ্চারিত শব্দে বানান ও অর্থ-পার্থক্য

সাড়া	- শব্দ, ডাকের জবাব, প্রতিক্রিয়া।
সারা	- সমগ্র, শেষ, আকুল।
শোনা	- শ্রবণ করা।
সোনা	- স্বর্ণ।
দেড়ী	- দেড়গুণ।
দেরি	- বিলম্ব।
জোড়	- যুক্ত, যুগল।
জোর	- বল, শক্তি, সামর্থ্য।
পাড়ি	- পারাপার।
পারি	- সমর্থ বা সক্ষম হই।

বানান সতর্কতা

শ্বশুর, অঙ্ক, ব্যথা, লক্ষ্মী, আশিস, গ=, আবির।

ব্যুৎপত্তি নির্দেশ

তিরিশ	< ত্রিশ	সোনা	< স্বর্ণ
বুক	< বক্ষ	পা	< পদ
গাঁ	< গ্রাম	আঁখি	< অক্ষি
মাটি	< মৃত্তিকা	চামার	< চর্মকার
পরান	< প্রাণ	দুখ	< দুঃখ
হাত	< হস্ড়	বুনো	< বন্য
শুনো	< শূন্য	সায়র	< সাগর
আন্ধার	< অন্ধকার	সাত	< সপ্ত
সাপ	< সর্প		

সাহিত্যবোধ ☐ শোক কবিতা

'কবর' কবিতার শুর=শোকবেদনা দিয়ে আর এর সমাপ্তিও ঘটেছে শোকার্ত হাহাকারে। জীবনের একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে বেদনা-ভরাক্রান্ড়কণ্ঠে বৃদ্ধ ব্যক্ত করেছেন নিজের পাঁচ-পাঁচজন পরমাত্মীয়য়ের মৃত্যুগাঁথা। সমস্ড়কবিতার পরতে শোনা যায় অনুচ্চ ক্রন্দনধ্বনির মর্মরিত মূর্ছনা।

প্রিয়জনের মৃত্যুতে এ কবিতায় মর্মান্ক্তি শোকের এক করুণ আবহ তৈরি হয়েছে। এ জন্যে এ জাতায় কবিতাকে শোক-কবিতা (elegy) বলা হয়। কখনও কখনও বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোক-কবিতা লেখা হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে স্ত্রী মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা '২২ শ্রাবণ ১৩৪৮', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পাথরের ফুল' বিশেষ উলেম্লখযোগ্য শোক-কবিতা।

সাহিত্যবোধ ☐ নাটকীয় স্বগতোক্তি

নাটকীয় স্বগতোক্তিতে বক্তা তার মনের একান্ড়ভাবনা, অনুভূতি কিংবা নাটকীয় অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে থাকেন। কোনো শ্রোতা উপস্থিত থাকলেও তার কোনো ভূমিকা থাকে না এবং বক্তার স্বগতোক্তিতে সে কোনোরকম বাধা দেয় না। এ পন্থায় লেখক বক্তার অন্তর্জগতের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

'কবর' কবিতাটি নাটকীয় স্বগতোক্তির চমৎকার উদাহরণ। এখানে বৃদ্ধ দাদুর জীবনের মর্মান্ক্তি দুঃখময় ঘটনা ও অভিজ্ঞতার গভীর ও নিবিড় শোকাবহ প্রকাশ ঘটেছে নাটকীয় স্বগতোক্তির মাধ্যমে শ্রোতা হিসেবে শিশু পৌত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও তার ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে নীরব শ্রোতার।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি বৃদ্ধের কোন আত্মীয়কে সোনালি ঊষার সোনামুখের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

ক. স্ত্রীকে খ. পুত্রবধূকে
গ. কন্যাকে ঘ. নাতনিকে

২. দাদু শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় কোন হাটে কেনাকাটা করতেন?

ক. গজনার হাটে খ. শাপলার হাটে
গ. উজানতলীর হাটে ঘ. কাজিবাড়ির হাটে

৩. কোনটি পেলে দাদি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন?

ক. পুঁতির মালা খ. তামাক মাজন
গ. নাকের নথ ঘ. হাটের তরমুজ

৪. 'মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক
আয়-আয় দাদু গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।' চরণ দুটিতে বৃদ্ধের মাটির প্রতি অগাধ ভালোবাসার কারণ–

i. মাটির তলেই রয়েছে প্রিয় বেহেশত
ii. মাটির লাঙল চালিয়ে সোনার ফসল ফলানো হয়
iii. তার কয়েকজন প্রিয় আত্মীয় এ মাটিতেই শায়িত রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. 'কবর' কবিতার ভাবার্থ হল, এটি–

i. একটি করুণ রসাত্মক কবিতা
ii. এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবন আলেখ্য
iii. মৃত্যু ভয়ে কাতর এক বৃদ্ধের স্বগতোক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. 'কবর' কবিতাটির শুরুতে প্রকাশ পেয়েছে কোনটি?

ক. শোকার্ত হাহাকার খ. শোক-গাঁথা
গ. গভীর বেদনা ঘ. গভীর সহানুভূতি

৭. "জোড় মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়"–এখানে 'জোড় মানিকেরা' বলতে কবি কাদেরকে বুঝিয়েছেন?

ক. ছেলে ও মেয়ে খ. মেয়ে ও নাতনি
গ. ছেলে ও ছেলের বউ ঘ. স্ত্রী ও ছেলে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বৃদ্ধ নওশের আলী তার ছোট ছেলে, ছেলের বউ এবং একমাত্র নাতি ফয়সালকে নিয়ে ভালোভাবেই দিন কাটাচ্ছিলেন। ফয়সালের সাথে তিনি একান্তরে শহীদ হওয়া তার স্ত্রী, বড় ছেলের স্মৃতিচারণ করতেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় ফয়সালের মৃত্যু হলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

৮. ফয়সালের সঙ্গে 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধের কোন প্রিয়জনের মিল রয়েছে?

ক. ছেলে　　খ. মেয়ে

গ. নাতি　　ঘ. নাতনি

৯. নওশের আলীর বর্তমান মানসিকতা নিচের কোন পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. পরাণের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে উঠে ক্ষণে ক্ষণে

খ. অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে

গ. মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কতদূর

ঘ. কথা কস নাকো, জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘরের দেয়ালের ফটোগ্রাফটি দেখিয়ে কবি অতিথি বন্ধুকে বললেন–

'এ আমার ছোট ছেলে, যে নেই এখন,
পাথরের টুকরোর মতন
ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে
বছর তিনেক আগে কাক ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।'

ক. 'কবর' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

খ. 'এ কথা লইয়া ভাবী-সাব মোরে তামাশা করিত শত'– ভাবি-সাব তামাশা করতেন কেন?

গ. 'সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে,'– এখানে শেষ শোওয়া উদ্দীপকের দৃশ্যপট অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত কবির ছেলের মৃত্যুস্মৃতি 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধের কোন বেদনাবোধের প্রতিনিধিত্ব করে– বিশ্লেষণ কর।

২. শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার, চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান।

ক. 'গহন' শব্দের কাব্যিক রূপ কী?

খ. 'মোর জীবনের রোজকেয়ামত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উপরের কবিতাংশের সাথে 'কবর' কবিতার ভাবগত পার্থক্য নিরূপণ কর।

ঘ. অনুচ্ছেদটির সাথে 'কবর' কবিতার ভাষাশৈলী কি সাদৃশ্যপূর্ণ? দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মতামত দাও।

৩. রহিম মুন্সি একজন বনেদি গেরস্থ ছিল। তার সোনা বউ গৃহকর্মের অবসরে তাকে সাহায্য করতেন। ছেলে মেয়েদের আনন্দ কোলাহলে তার বাড়ির আঙিনা ছিল মুখরিত। এ ছেলে-মেয়েরা গ্রামের স্কুলের পাঠ চুকিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে চলে যায়। শিক্ষাজীবন শেষে তারা বিয়ে-শাদী করে শহরে বসবাস করতে থাকে। এর মধ্যে এক ছেলে এবং এক মেয়ে দেশ ছেড়ে প্রবাস জীবন শুরু করে। এমনি করে রহিম মুন্সির বাড়ির আনন্দ কোলাহল থেমে যায়। এরপরেও তিনি সোনা বউকে নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। একদিন হঠাৎ বুকের ব্যথা ওঠে তার বউ মারা যায়। মায়ের মৃত্যু সংবাদে ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসে। দু'চারদিন যেতে না যেতেই যে যার গন্তব্যে ফিরে যায়। তিনি একাকী নিজ ভিটে বাড়িতে মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। আর জায়নামাযে বসে স্ত্রীর জন্য দু'আ এবং সন্তানদের মঙ্গল কামনা করেন।

ক. জীবনের কোন অনুভূতি দিয়ে কবর কবিতা শুরু হয়েছে?

খ. 'মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি'– বৃদ্ধের এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ. 'কবর' কবিতার কোন দিকটি রহিম মুন্সির জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "রহিম মুন্সি এবং 'কবর' কবিতার বৃদ্ধের সময়কার জীবনবোধ ভিন্ন সূত্রে গাঁথা"– বিশেষণ কর।

তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামাল

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙালি মুসলমান নারীদের কাটাতে হত গৃহবন্দি জীবন। স্কুল কলেজে পড়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। পরিবারে বাংলা ভাষার প্রবেশ একরকম নিষিদ্ধ ছিল। ঐ বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। পারিবারিক নানা উত্থান পতনের মধ্যে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন তিনি। তারই মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় নিজেকে নিবেদিত করেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে তিনি শুধু মহিলা কবি হিসেবেই বরণীয় হননি, বাংলাদেশে জনমানসে ভাস্বর হয়েছেন নন্দিতা মাতৃমূর্তিতে।

সুফিয়া কামালের উলেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', ' কেয়ার কাঁটা', উদাত্ত পৃথিবী' ইত্যাদি। তিনি গল্প, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা ইত্যাদিও লিখেছেন। অনেকগুলো পদক ও পুরস্কারের ভূষিথ হয়েছেন সুফিয়া কামাল। এর মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে: বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক ইত্যাদি।

সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কুমিলাস্থ। তাঁর জন্ম ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালে এবং মৃত্যু ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায়।

"হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তেড়রিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?"
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"

"এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম, "কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"
কহিল সে সুদূরে চাহিয়া–
"অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।"
কহিলাম, "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,

বসন্তবন্দনা তব কণ্ঠে শুনি-এ মোর মিনতি।"
কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে–
"নাই হল, না হোক এবারে–
আমারে গাহিতে গান, বসন্তের আনিতে বরিয়া–
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।"

কহিলাম : "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই"
কহিল সে পরম হেলায়–
"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?"

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরে আসি–
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।"

শব্দার্থ ও টীকা

হে কবি	-	কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্বোধন করেছেন।
নীরব কেন	-	উদাসীন হয়ে আছেন কেন? কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না?
ফাগুন যে এসেছে ধরায়	-	পৃথিবীতে ফালগুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।
বরিয়া	-	বরণ করে।
লবে	-	নেবে।
তব বন্দনায়	-	তোমার রচিত বন্দনা-গানের সাহায্যে। অর্থাৎ বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে কি তুমি বরণ করে নেবে না?
দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?	-	কবির জিজ্ঞাসা-বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কিনা। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ করেন নি তার এই জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়।
সমীর	-	বাতাস।

বাতাবি নেবুর ফুল ... অধীর আকুল	-	বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দিগ্বিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু উন্মনা কবি এসব কিছুই লক্ষ করেন নি। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর উদাসীনতাকেই স্পষ্ট করে।
এখনো দেখ নি তুমি?	-	কবিভক্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ করছেন না।
উন্মনা	-	অন্যমনস্ক, অনুৎসুক।
কোথা তব নব পুষ্পসাজ?	-	বসন্তএসেছে অথচ কবি নতুন ফুলে ঘর সাজান নি। নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেন নি।
অলখ	-	অলক্ষ, দৃষ্টির অগোচর।
পাথার	-	সমুদ্র।
রচিয়া	-	রচনা করে।
লহ	-	নাও।
বসন্তবন্দনা	-	বসন্তঋতুকে স্তুতি।
বরিয়া	-	বরণ করে।
বসন্তেরে আনিতে... ফাগুন স্মরিয়া	-	কবি বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে বরণ না করলেও বসন্তঅপেক্ষা করেনি। ফাল্গুন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্তএসেছে।
করিলে বৃথাই	-	ব্যর্থ করলে। অর্থাৎ কবি-ভক্তের অনুযোগ-বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে।
হেলায়	-	অবজ্ঞাভরে, অবহেলা করে।
পুষ্পারতি	-	ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।
পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন?	-	ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ ও বন্দনা করার জন্য গাছে গাছে ফুল ফোটে নি? অর্থাৎ বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই যেন ফুল ফোটে।
মাধবী	-	বাসন্তীলতা বা তার ফুল।
অর্ঘ্যবিরচন	-	অঞ্জলি বা উপহার রচনা। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে।
বিমুখতা	-	অনাগ্রহ। বিরূপ ভাব। অপ্রসন্নতা।
উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন		
কবি দাও তুমি ব্যথা	-	কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কবি যথারীতি সানন্দে বসন্তবন্দনা না করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন।
কুহেলী	-	কুয়াশা।

উত্তরী	-	চাদর। উত্তরীয়।
কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী	-	কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। বসন্ত আসার আগে সর্বত্যাগী সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো মাঘের শীত যেন কুয়াশার চাদর গায়ে মিলিয়ে গেছে।
পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে	-	শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।
তাহারেই পড়ে মনে	-	প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ন ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত তার কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্তার মনে কোন সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোন আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা-পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্নতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

উৎস

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় [নবম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪২] প্রথম প্রকাশিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বসন্তে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দ শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে ছন্দে সুরে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবিমন যদি কোনো কারণে শোকাচ্ছন্ন কিংবা বেদনাতুর থাকে তবে বসন্তের সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না।

এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯৩২) কবির জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্নতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে সেই বিষাদময় রিক্ততার সুর।

তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা।

কবিতাটির আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর নাটকীয়তা। গঠনরীতির দিক থেকে এটি সংলাপনির্ভর রচনা। কবিতার ভাবাবেগময় ভাববস্তুর বেদনাঘন বিষণ্ণতার সুর এবং সুললিত ছন্দ এতই মাধুর্যমন্তি যে তা সহজেই পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়।

ছন্দ

কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ৮ ও ১০ মাত্রার পর্ব। স্তবক বিন্যাসে কিছুটা বৈচিত্র্য আছে।

অনুশীলনীমূলক কাজ

কবিতা উপলব্ধি

১. এ কবিতার বর্ণনাকারী কে? কবি নিজে? না কবিভক্ত?

২. লক্ষ করলে বুঝতে পারবে পুরো কবিতাটি রচিত হয়েছে কবি ও কবিভক্তের সংলাপের মাধ্যমে। একজন ছাত্র কবিভক্তের ভূমিকা এবং একজন ছাত্রী কবির ভূমিকা নাও। এবার দুজনে নিজ নিজ অংশ আবৃত্তি কর।

৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার কথা করিব মনে পড়েছে? কেন? এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে কি?

শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ

নীরব	<	নিঃ + রব	উন্মনা	<	উৎ +মনা
ফাগুন	<	ফাগুন্চ	সাজ	<	সজ্জা
আঁখি	<	অক্ষি	অলখ	<	অলক্ষ
দুয়ার	<	দ্বার	কুঁড়ি	<	কোরক
দখিনা	<	দক্ষিণ + আ	দিগন্ড়	<	দিক + অন্ড়
আজ	<	অদ্য	পুষ্পারতি	<	পুষ্প + আরতি।

বাতাবি - একরকম বড় আকারের লেবু। যবদ্বীপের রাজধানী 'বাটাভিয়া, থেকে প্রথম আনীত হয় বলে এই নামকরণ হয়েছে।

মিনতি - সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত শব্দযোগে তৈরি হয়েছে।

বানান সতর্কতা [ঈ-কার]

নীরব, সমীর, অধীর, তরী, আগমী, গীতি, মাধবী, তীব্র, সন্ন্যাসী, ধীরে, উত্তরী।

না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ

নি - এখনো দেখ নি তুমি?
ফুল কি ফোটে নি শাখে?
পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন? রাখি নি সন্ধান
রহে নি, সে ভুলে নি তো!

না- বসন্তেশ্বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?

রচিয়া লহ না আজও গীতি।
ভুলিতে পারি না কোন মতে।

নাই- শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান
নাই হল, না হোক এবার
করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'তাহারেই পড়ে মনে'- কবিতার বর্ণনাকারী চরিত্র কোনটি?

ক. কবি স্বয়ং খ. কবি ভক্ত
গ. বৃদ্ধ দাদু ঘ. কুললক্ষ্মী

২. 'তাহারেই পড়ে মনে'– কবিতায় বসন্তের প্রতি কবির বিমুখতার কারণ –

i. অতীত প্রীতি
ii. ব্যক্তিগত দুঃখবোধ
iii. শীত ঋতুর বিদায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

"শ্যামল-কাজল বন আমার ভালো লাগে
তবে আমারও প্রতিজ্ঞা আছে অনেক
যেতে হবে বহুদূর-ঘুমিয়ে পড়ার আগে।"

৩. অনুচ্ছেদের 'শ্যামল-কাজল বন' 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ঋতুর রূপক?

ক. শরৎ খ. হেমন্ড়
গ. শীত ঘ. বসন্ড়

৪. অনুচ্ছেদের মূলভাব নিচের কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. রহেনি সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া
খ. তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে
গ. বসন্ড়বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি এ মোর মিনতি
ঘ. তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান

৫. গঠনরীতির দিক থেকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কোন ধরনের কবিতা?

http://zabdar.org

ক. স্বগতোক্তি
খ. কাহিনীমূলক
গ. সাধারণ বর্ণনা
ঘ. সংলাপ নির্ভর

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হিম কুহেলির অস্পষ্ট তলে আজিকে পুলক জাগে
রাঙিয়া উঠেছে পলাশ কনিকা মধুর রঙ্গিন রাগে।
আসিবে এবার ঋতুরাজ বুঝি
তারি বাঁশি ওঠে মলয়েতে বাজি
****
****
দূরে সরে গেছে হিম জর্জর
কুয়াশা ঢাকা বেদনা নিথর
মর্মরি ওঠে মধুর রাগিণী বন-নিকুঞ্জ তলে
সুন্দর সে যে হাসিতে তাহার নিখিল ভুবন ভোলে।

ক. 'কুঁড়ি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কর।

খ. শীত ঋতুকে কবি কেন 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলেছেন?

গ. অনুচ্ছেদের প্রথমাংশের ভাবটি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার সংলাপে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদের বর্ণিত ঋতুর সঙ্গে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ঋতুর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে'– এ উক্তিটির সঙ্গে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার জন্যে বিয়ের পর অনিন্দিতা সবসময় স্বামী ধ্রুবগুপ্তের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সুখী দাম্পত্য জীবন দীর্ঘায়িত হয় নি। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি থেমে যান নি, একাকী জীবন-যাপন করলেও বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এ ছাড়া তিনি নারী শিক্ষার জন্য নিয়েছেন নানা উদ্যোগ। সর্বক্ষেত্রেই স্বামীর স্মৃতি ছিলো তাঁর অনুপ্রেরণাস্থল।

ক. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল সুর কী?

খ. বসন্তের সৌন্দর্য কবির কাছে অর্থহীন কেন?

গ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কোন ঋতুর সঙ্গে উদ্দীপকের অনিন্দিতার স্বামীর চিরবিদায়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোন মতে'– কবির এ মনোভাবের সঙ্গে স্বামীহারা অনিন্দিতার মনোভাবের তুলনা কর।

পাঞ্জেরি

ফররুখ আহমদ

কবি-পরিচিতি

চল্লিশের দশকে আবির্ভূত শক্তিমান কবিদের অন্যতম ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এর পর একে একে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য ও কাহিনীকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী এ কবির কবিতায় প্রধানত প্রকাশ ঘটেছে ইসলামী আদর্শ ও জীবনবোধের। কর্মজীবনে বহু বিচিত্র পেশা অবলম্বন করেছেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ড়দীর্ঘকাল ধরে স্থিত হয়েছেন ঢাকা বেতারে 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে। তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা', কাব্যনাট্য ' নৌফেল ও হাতেম', সনেটসংকলন 'মুহূর্তের কবিতা' এবং কাহিনীকাব্য 'হাতেম তায়ী'। এ ছাড়া তিনি ছোটদের জন্য বেশ কিছু ছড়া ও কবিতা লিখে গেছেন।

সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছেন এবং মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন।

ফররূখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে। তাঁর মৃত্যু ঢাকায় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
দীঘল রাতের শ্রান্ড়াফর শেষে
কোন দরিয়ার কালো দিগন্ড়ে আমরা পড়েছি এসে?
এ কী ঘন-সিয়া জিন্দেগানীর বা'ব
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ড়া'ব
অস্ফুট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?

বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে,
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে,
বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা, পেরেশান মুসাফির দল
দরিয়া কিনারে জাগে তক্‌দিরে
নিরাশার ছবি এঁকে।
পথহারা এই দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে
চলেছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
একাকী রাতের স্নান জুলমাত হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া–অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।
মোদের খেলার ধূলায় লুটায়ে পড়ি
কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।
সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।
ও কি বাতাসের হাহাকার, – ও কি
রোনাজারি, ক্ষুধিতের!
ও কি দরিয়ার গর্জন, – ও কি বেদনা মজলুমের!
ও কি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী।

পাঞ্জেরি!
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি!
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরি, কত দেরি!!

শব্দার্থ ও টীকা

পাঞ্জেরি	-	যে নৌ-কর্মচারী জাহাজের অগ্রভাগে বা মাস্তুলসংলগ্ন বাতি দিয়ে চারপাশ দেখে মাঝিকে পথ নির্দেশক সংকেত দেয়। প্রতীকী অর্থ-জাতির পথপ্রদর্শক।
সেতারা	-	তারা, নক্ষত্র।
হেলাল	-	চাঁদ।
মাস্তুল	-	নৌকা, জাহাজ ইত্যাদিতে পাল লাগানোর দ ঁ।
ঘন-সিয়া	-	নিবিড় কালো (অন্ধকার)।
জিন্দেগানির বা'র	-	জীবনের অধ্যায় বা পর্যায়।
মর্সিয়া	-	শোকগীতি।
খা'ব	-	স্বপ্ন।
হেরি	-	দেখি, প্রত্যক্ষ করি, অবলোকন করি।
পেরেশান	-	উদ্বিগ্ন, চিন্ড়িত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ক্লান্ড়।
মুসাফির	-	পথিক, সফলকারী, যাত্রী, পর্যটক।
তকদির	-	ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল, নসিব।
জুলমাত	-	অন্ধকার।
গাফলত	-	অবহেলা, ঔদাসীন্য। অমনোযোগিতা। ভুলচুক।
শর্বরী	-	রাত্রি।
আহাজারি	-	হাহাকার।
রোনাজারি	-	কান্না, ক্রন্দন।
মজলুম	-	অত্যাচারিত।
ভ্রূকুটি	-	ক্ষোভ, ক্রোধ ইত্যাদির কারণে ভুরুর কুঞ্চন বা কুঞ্চিত অবস্থা।
কৈফিয়ত	-	জবাবদিহি, কারণ দেখিয়ে জবাব।

উৎস

ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' থেকে 'পাঞ্জেরি' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটিতে জাতীয় জীবনের অগ্রযাত্রার কা ারীকে যেমন প্রতীকী তাৎপর্য দেয়া হয়েছে 'পাঞ্জেরি' কথাটিও অনুরূপ এবং একই তাৎপর্যমি ত।

ছন্দ

কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। মূল পর্ব ৬ মাত্রার । চরণের পর্ববিন্যাস মূলত এ রকম ৬ + ৬ + ২। তবে সর্বত্র সমতার বাঁধন নেই।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিশিষ্টতা

'পাঞ্জেরি' ফররুখ আহমদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। একটি একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় পাঞ্জেরি জাতির কর্ণধারের প্রতীক। কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ ও চিত্রকল্প এমনিভাবে নানা প্রতীকী তাৎপর্যমন্ডিত। কবিতাটিতে সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে কবি জাতীয় বিরাজমান সঙ্কট উত্তরণে জাতীয় নেতৃত্বের সচেতন ভূমিকা প্রত্যাশা করেছেন। এভাবে আপাতবর্ণিত ভাববস্তুর আড়ালে আমরা অন্তর্নিহিত আলাদা ভাববস্তু পাই।

এ কবিতায় ভাবকল্পনা ও আবেগ মাধুর্য রূপায়ণে ধ্বনিসৌকর্য, শব্দব্যবহার, চিত্রকল্প রচনা ও রূপক-প্রতীক সৃষ্টিতে কবি চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আরবি-ফারসি শব্দ

এ কবিতায় ভাবানুষঙ্গ রচনায় কবি বেশ কিছু আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলোর সারিবদ্ধ একটি তালিকা তৈরি কর। এবার মিলিয়ে দেখ নিচের শব্দগুলো তোমার তালিকায় আছে কিনা। এর পর এগুলোর অর্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার করা যায় কি না দেখ:

পাঞ্জেরি, আসমান, সেতারা, হেলাল, সফর, দরিয়া, সিয়া, জিন্দেগানী, বা'ব, মর্সিয়া, তুফান, খা'ব, হাওয়া, পেরেশান, মুসাফির, তকদির, জুলমাত, গাফলত, সওদাগর, আহাজারি, আওয়াজ, রোনাজারি, মজলুম, কৈফিয়ত।

কবিতার ভাববস্তু উপলব্ধি।

এ কবিতায় বেশ কিছু শব্দ বিশেষ অর্থসূচক প্রতীকী শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ কর:

শব্দ	সাধারণ অর্থ	বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য
পাঞ্জেরি	জাহাজের অগ্রভাগের পথনির্দেশক আলো বা বাতিধারী নৌকর্মী	জাতির পথপ্রদর্শক
আসমান	আকাশ	জাতীয় জীবন
মেঘ	নৌযাত্রায় দুর্যোগের আভাস	জাতীয় জীবনে দুর্যোগের আভাস
সেতারা, হেলাল	নৌযাত্রায় পথনির্দেশক বা আশার আলো	জাতীয় জীবনে সংকট উত্তরণের সম্ভাবনার ইঙ্গিত
অসীম কুয়াশা	নৌযাত্রায় অচল অবস্থার কারণ	জাতীয় জীবনে অচলাবস্থার প্রতীক
রাত	অন্ধকারময় পরিবেশ	জাতীয় জীবনের সংকটজনক কালো অধ্যায়

কবিতায় ব্যবহৃত এ ধরনের অন্যান্য শব্দ খুঁজে বের কর এবং সেগুলোর সাধারণ অর্থ ও প্রতীকী তাৎপর্য লিপিবদ্ধ কর। এভাবে এ কবিতার ভাববস্তুর দুটো রূপ তোমাদের কাছে ধরা পড়বে। একটি হবে জাহাজ যাত্রার প্রতিকূলতার ছবি। অন্যটি হবে জাতীয় জীবনের সংকট ও তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা। এবার আলাদা দুটি শিরোনামে দুটি অনুচ্ছেদে কবিতার আপাতদৃষ্ট ভাববস্তু এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য লেখ।

সাহিত্যবোধ ❑ রূপক কবিতা

রূপক কবিতা বলতে এমন ধরনের কবিতা বোঝায় যেখানে কবি তাঁর কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে সরাসরি প্রকাশ না করে অন্য কোনো বাহ্যিক ঘটনা, চিত্র ইত্যাদির আড়ালে রেখে সমান্তরালে ব্যঞ্জিত করে থাকেন। রূপকের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে Allegory । গ্রিক ভাষায় এর অর্থ হল-'অন্য কিছুকে বোঝাচ্ছে'। রূপক কবিতায় ভাববস্তুর দুটো দিক থাকে। একটি হল আপাতদৃষ্ট ভাববস্তু। অন্যটি হল অন্তর্নিহিত সমান্তরাল ভাববস্তু। অর্থাৎ রূপক কবিতায় বাইরের অর্থ হচ্ছে বাচ্যার্থ, আর অন্তর্নিহিত অর্থ হল নিহিতার্থ।

সুতরাং রূপক কবিতা হচ্ছে বাইরের রূপের আড়ালে ভেতরের রূপের আভাসদানকালী কবিতা।

'পাঞ্জেরি' এ ধরনের একটি রূপক কবিতা। 'কবিতার ভাববস্তু উপলব্ধি' অংশটির সাহায্য নিলে কবিতাটির রূপক তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'জিন্দেগানির বা'ব' বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. জীবনের পর্যায়কে খ. জীবনের পরাজয়কে
গ. জীবনের জয়কে ঘ. জীবনের ক্ষয়কে

২. 'ঘন-সিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে–
ক. কালো মেঘ খ. নিবিড় কালো
গ. ঘন কুয়াশা ঘ. কালো রাত্রি

৩. 'বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোণে'- কিসের জন্যে?
ক. পরপারে যাবার জন্য খ. নেতার আগমনের জন্য
গ. জাহাজে ওঠার জন্য ঘ. নতুন সকালের জন্য

৪. 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?' এই পঙ্‌ক্তির মাত্রা সংখ্যা কত?
ক. ৬+৬+২=১৪ খ. ৬+৪+৪=১৪
গ. ৮+২+৪=১৪ ঘ. ৮+৩+৩=১৪

৫. পাঞ্জেরি কবিতার মূলভাব সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে-
ক. চিত্রকল্পে খ. ছন্দে
গ. অনুপ্রাসে ঘ. রূপকে

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানিনা তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ।
ক. 'পাঞ্জেরি' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?' – এই পঙক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদের আলোকে 'পাঞ্জেরি' কবিতার বিষয়বস্তু উপস্থাপন কর।

ঘ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'পাঞ্জেরি' শীর্ষক কবিতার শৈলীগত সম্পর্ক বিচার কর।

২. দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রিরা হুশিয়ার
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

ক. 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?' উক্তির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুচ্ছেদের সাথে 'পাঞ্জেরি' কবিতার মিল কোথায়-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান' পঙক্তির সঙ্গে 'পাঞ্জেরি' কবিতার ভাববস্তুর তুলনামূলক-বিচার বিশ্লেষণ কর।

http://zaadgar.org

আমার পূর্ব বাংলা

সৈয়দ আলী আহসান

কবি-পরিচিতি

সৈয়দ আলী আহসান একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

কর্মজীবনে তিনি অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা, করাচি ও চট্টোগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা একাডেমীর পরিচালক এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি।

সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবিদের একজন। তাঁর কবিতার ভাববস্তুতে ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতি এবং সেইসঙ্গে রূপরীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় আছে। তাঁর উলেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছেঃ কাব্যগ্রন্থ–'অনেক আকাশ', 'একক সন্ধ্যায় বসন্ড' 'সহসা সচকিত', 'আমার প্রতিদিনের শব্দ', 'সমুদ্রেই যাবো'; গবেষণা ও প্রবন্ধগ্রন্থ-'কবি মধূসূদন', 'রবীন্দ্র কাব্যবিচারের ভূমিকা', 'কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', 'সতত স্বাগত', 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য'; অনুবাদগ্রন্থ-'হুইটম্যানের কবিতা'। এ ছাড়াও তাঁর একাধিক স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসান বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও পদক লাভ করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মাগুরা জেলার আলোকদিয়ায়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ২৫শে জুলাই ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে।

আমার পূর্ব-বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতায় ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো বিমুগ্ধ বেদনার শান্ড়ি
আমার পূর্ব-বাংলা বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ
হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া
সিক্ত নীলাম্বরী
নিকুঞ্জের তমাল কনক-লতায় ঘেরা
কবরী এলো করে আকাশ দেখার
মুহূর্ত

অশেষ অনুভব নিয়ে

পুলকিত সচ্ছলতা

এক সময় সূর্যকে ঢেকে অনেক মেঘের পালক,

রাশি রাশি ধান মাটি আর পানির

কেমন নিশ্চেতন করা গন্ধ

কত দশা বিরহিণীর– এক দুই তিন

দশটি

এখানে ত্রস্ত আকুলতায় চিরকাল

অভিসার

ঘর আর বিদেশ আঙিনা

আকুলতায় একাকার

তিনটি ফুল আর অনেক পাতা নিয়ে

কদম্ব তরুর একটি শাখা মাটি

ছুঁয়েছে

আরও অনেক গাছ পাতা লতা

নীল হলুদ বেগুনি অথবা সাদা

অজস্র ফুলের বন্যা অফুরন্ত

ঘুমের অলসতায় চোখ বুঁজে আসার মতো

শান্তি

কাকের চোখের মতো কালোচুল

এলিয়ে

পানিতে পা ডুবিয়ে-রাঙা-উৎপল

যার উপমা

হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া স্নিগ্ধ নীলাম্বরীতে

দেহ ঘিরে

যে দেহের উপমা স্নিগ্ধ তমাল–

তুমি আমার পূর্ব বাংলা–

পুলকিত সচ্ছলতায়, প্রগাঢ় নিকুঞ্জ ॥

শব্দার্থ ও টীকা

একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল	-	এ চিত্রকল্পটি 'ব্যবহৃত হয়েছে পূর্ব বাঙলার উপমা হিসেবে। কবির ভাব এখানে পেয়েছে একান্ড়ও অন্ড়রঙ্গ ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্রতা। অন্ধকারের তমালগুচ্ছ যে অনুপম কোমল মাধুর্যের দ্যোতনা দেয়, পূর্ব বাঙলার শ্যামল শান্ড়কোমল পরিবেশ যেন ঠিক তেমনি। তা যেন কবির চোখে মোহাঞ্জন সৃষ্টি করে।
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়		
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ	-	পাতায় ছাওয়া লতায় ঘেরা গৃহ যেমন অনুপম আবাস, সবুজ-শ্যামল পূর্ব বাংলাও কবির কাছে তেমনি। একটি চিত্রকল্প।
নিকুঞ্জ	-	লতাগৃহ। অরণ্যে বা উদ্যানে লতাপাতা ঘেরা কুটিরের মত জায়গা।
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো	-	দিনের কর্মকোলাহলের শেষে সন্ধ্যালগ্নে প্রকৃতিতে যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের বিস্ড়ার হয় তা মনে যে অপূর্ব ভাব জাগায়। একটি উপমা।
সরোবরের অতলের মতো	-	শান্ড়শীতল অনুভূতির গভীরতা বোঝাতে ব্যবহৃতত হয়েছে। এটিও উপমা। দুটি উপমাই প্রশান্ড়ি ভাব জাগ্রত করে।
বিমুগ্ধ বেদনার শান্ড়ি	-	কবির এ অনুভবে বিষণ্নতার মধ্যে এক ধরনের প্রশান্ড়ি আভাস রয়েছে।
বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ	-	এ অভিব্যক্তিতে আবহমান বাংলা কবিতায় বর্ষার অন্ধকার রাতে নায়ক-নায়িকার প্রেমের অনুরাগের ঐতিহ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্মরণীয়; এমন দিনে তারে বলা যায়। এমন ঘনঘোর বরষায়।" (রবীন্দ্রনাথ)
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া- সিক্ত নীলাম্বরী	-	এ চিত্রকল্পে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষা রাতে রাধার বিরহের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়? বর্ষাকে উপেক্ষা করে বিরহ বিহ্বলা রাধা নীল শাড়ি পরে নায়কের মনে যে গীভর অনুরাগের জন্ম দিয়ে এসেছে পূর্ব বাংলার নীলাভ শ্যামল প্রকৃতির পরিবেটন তেমনি কবির অন্ড়র ছুঁয়ে যায়। চিত্রকল্পটিতে কবির হৃদয়াবেগ ও বূপমুগ্ধত প্রকাশিত হয়েছে।
কনক-লতা	-	স্বর্ণলতা।
কবরী এলো করে		
আকাশ দেখার মুহূর্ত	-	এ চিত্রকল্পটিতেও মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত 'মেঘদূত' কাব্যে নবমেঘের সঞ্চারে উৎফুলণ্ডনারীর কেশ আলুলায়িত করে আকাশ অবলোকনের প্রসঙ্গ নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নবমেঘের সঞ্চার তন্বী-হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার করে সেই আনন্দ কবি অনুভব করেন এ দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে।

অশেষ অনুভব নিয়ে
পুলকিত সচ্ছলতা - বাংলাদেশের রূপবৈচিত্র্য কবির অনুভূতির বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত এবং সেগুলো তার অফুরন্ত আনন্দের উৎস।

কত দশা বিরহিণীর -
এক দুই তিন দশটি - বৈষ্ণব কবিতায় বর্ণিত রাধার বিরহের দশটির অবস্থার উল্লেখসূত্রে কবি পূর্ব বাংলার মানুষের ভাবাবেগের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকেও এ দেশের অস্তিত্বের সঙ্গে একীভূত করে দেখেছেন।

এখানে এ আকুলতায়
চিরকাল অভিসার/ঘর আর বিদেশ
আঙিনা আকুলতায় একাকার - বৈষ্ণব কবিতার ঐতিহ্যের অনুসরণে কবি এ দেশের মানুষের হৃদয়াবেগের চিত্র এঁকেছেন। প্রেমবিহ্বল এদেশের মানুষ আবহমানকাল ধরে ঘরকে করেছে বাহির, বাহিরকে করেছে ঘর।

কাকের চোখের মত
কালো চুল এলিয়ে - কবি পূর্ব বাংলাকে মমতাময়ী নারীমূর্তি রূপে কল্পনা করতে গিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে কালোচুলের সঙ্গে উপমিত করেছেন।

পানিতে পা ডুবিয়ে - বর্ষাকালে পূর্ব বাংলার মাঠঘাট পানিতে ডুবে যায়। কবি কল্পনা করেছেন মূর্তিমতী পূর্ব বাংলা যেন তখন পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে, যেমন করে পানিতে ভেসে থাকে রাঙা পদ্ম।

হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া স্নিগ্ধ
নীলাম্বরীতে দেহ ঘিরে - বর্ষাস্নাত পূর্ব বাংলার নীলাভ শ্যামল প্রকৃতি যেন মূর্তিমতী নারীরূপী পূর্ব বাঙলার দেহ ঘিরে থাকা নীল শাড়ি।

পুলকিত স্বচ্ছলতা প্রগাঢ় নিকুঞ্জ - পূর্ব বাংলা কবির চোখে সীমাহীন আনন্দ ও সৌন্দর্যের এক সুগভীর আকর্ষণীয় লতা-নিকুঞ্জের সঙ্গে তুলনীয়।

উৎস ও পরিচিতি

'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে সৈয়দ আলী আহসানের 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থ থেকে। কবিতাটিতে কবির সৌন্দর্যপ্রীতি ও স্বদেশচেতনা নানা উপমা-রূপক ও চিত্রকল্পের সুনিপুন বিন্যাসে এক অখণ্ড ভাবমূর্তিতে উজ্জ্বল। কবির একান্ত অন্তরঙ্গ অনুভূতির স্নিগ্ধ ফসল কবিতাটি।

স্বদেশের রূপলাবণ্য ও বৈচিত্র্যে কবি অভিভূত। পূর্ব বাংলার প্রকৃতি তাঁর অন্তরে অজস্র অনুভবের সৃষ্টি করেছে। আর কবি সেই ভাবের প্রবাহকে একের পর এক পরতে পরতে সাজিয়েছেন উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পে। একই সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের অনপুম ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গের।

প্রকৃতির অজস্র রূপময়তা, ব্যক্তিগত অনুভব, শেকড়সন্ধানী চেতনা-সব মিলিয়ে শিল্পসফল এ কবিতাটি নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র একটি বাক্যের আধারে। নিঃসন্দেহে এটি কবির আধুনিক শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্যের এক ঐশ্বর্যময় ফসল।

ছন্দ

'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব বা মাত্রাসাম্য রক্ষিত হয় না। কিন্তু কবি একটি অনতিনিরূপিত ধ্বনি সৃষ্টি করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

ভাষা অনুশীলন ☐ সম্বন্ধ পদ

কোনো কিছু বর্ণনা বা ভাবানুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় সম্বন্ধ পদের ব্যবহার করে থাকি। ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ বলতে কোনো কিছুর সঙ্গে অন্য কিছুর সম্পর্ককে বোঝায়। সাধারণত যার সঙ্গে শব্দের শেষে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যোগ করে সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় সম্বন্ধ পদের ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় ব্যবহার দেখা যায়। যেমনঃ

অন্ধকারের তমাল।

অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতা

কালো কেশ মেঘের সঞ্চয়

বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি

আকাশ দেখার মুহূর্ত

কদম্ব তরুর একটি শাখা

অজস্র ফুলের বন্যা।

কোনো কোনো সম্বন্ধপদ উপমা ব্যবহারে সহায়ক হয়েছে :

ক) সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি

খ) ঘুমের অলসতায় চোখ বুঁজে আসার মতো
শান্তি

গ) কাকের চোখের মতো কালোচুল
এলিয়ে

বানান সতর্কতা

সন্ধ্যা, নীলাম্বরী, কবরী, মুহূর্ত, সূর্য, বিরহিণী, প্রগাঢ়, ত্রস্ত্রসচ্ছলতা।

উপসর্গ অ- যোগে গঠিত শব্দ

অতল, অশেষ, অফুরন্ড়অলসতা।

কবিতার অলংকার ❑ চিত্রকল্প

চিত্রকল্প বলতে এমন সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার বোঝায়, যার সাহায্যে মনের পর্দায় বর্ণিত বস্তু বা ভাবের একটা ছবি ওঠে। 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ড়পুরোটাই গড়ে উঠেছে নানা চিত্রকল্পের সমাহারে। যেমন কবিতাটির শুরুতেই আছে:

আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল।

এখানে 'একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল' কথাটা সহজেই আমাদের মনের পর্দায় একটি ছবির আভাস দেয়। কবিতাটি মনোযোগসহকারে পড় এবং চিত্রকল্পগুলো খুঁজে বের কর।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতাটি কবির উজ্জ্বল উপস্থাপন তাঁর–

ক. সৌন্দর্য ও স্বদেশ চেতনায় খ. প্রকৃতি ও মানবপ্রেমে
গ. মুক্তিযুদ্ধ ও একুশের চেতনায় ঘ. দেশপ্রেম ও মানবতায়

২. 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. গদ্য ঘ. স্বরবৃত্ত

৩. গদ্যছন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. নির্ধারিত পর্বসংখ্যা রক্ষা করা যায় না
ii. সুনির্দিষ্ট তাল বিভাজন থাকে না
iii. কোন ছন্দ রীতি মেনে চলে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

এ সখি, হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

৪. কবিতাংশটির ভাবের মিল রয়েছে নিচের কোনটিতে?

ক. ঘর আর বিদেশ আঙিনা
আকুলতার একাকার

খ. কত দশা বিরহিণীর-এক দুই তিন
দশটি

গ. এখানে ত্রস্ড়আকুলতায় চিরকাল
অভিসার

ঘ. ঘুমের অলসতার চোখ বুঁজে আসার মতো
শান্ড়ি

৫. কবিতাংশটিতে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার অন্যতম কোন ভাবের প্রকাশ পেয়েছে?-
ক. হৃদয়ের ব্যাকুলতা
খ. বিচ্ছেদের অনুভূতি
গ. মিলনের আকুলতা
ঘ. শান্তির অন্বেষা

৬. 'অশেষ অনুভব নিয়ে
i. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর;
ii. আমি যে দেখিতে চাই; আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;
iii. জীবন অথবা মৃত্যু চোখে র'বে–আর এই বাংলার ঘাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আসুন ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান
রঙের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা
আপনি কোনো শিল্পীর কাজে পাবেন না, বস্তুত শিল্প মানেই নকল নয় কি?
অথচ দেখুন, এই বিশাল ছবির জন্য ব্যবহৃত সব উপকরণ
অকৃত্রিম :
ক. বিরহিণীর দশা কয়টি?
খ. 'প্রগাঢ় নিকুঞ্জ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. 'রঙের এমন ব্যবহার' অংশটিতে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. এই বিশাল ছবিই 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে- বিশ্লেষণ কর।

২. এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তিআসে মানুষের মনে;
এখানে সুবজ শাখা আঁকাবাঁকা হলুদ পাখিরে রাখে ঢেকে
জামের আড়ালে সেই বউকথাকওটিরে যদি ফেল দেখে
একবার, -একবার দু'পহর অপরাহ্নে যদি এই ঘুঘুর গুঞ্জনে
ধরা দাও,-তাহলে অনন্তকাল থাকিতে যে হবে এই বনে;
মৌরির গন্ধমাখা ঘাসের শরীরে ক্লান্তদহটিরে রেখে
আশ্বিনের ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামা পোকাদের কাছে ডেকে
র'ব আমি; -চকোরীর সাথে যেন চকোরের মতন মিলনে;
ক. 'আমার পূর্ববাংলা' কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?
খ. 'হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. কবিতাংশ ও 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় শান্তির উৎসের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রকৃতির রূপময়তায় সাদৃশ্য থাকলেও কবিতাংশটির সাথে 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার ব্যক্তিগত অনুভবের পার্থক্য বিদ্যমান – মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

আঠারো বছর বয়স

সুকান্তভট্টাচার্য

কবি-পরিচিতি

সুকান্তভট্টাচার্য রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর যুগের বিদ্রোহী তরুণ কবি, যিনি নজরুলের মতোই তাঁর কাব্যে উচ্চারণ করে গেছেন অন্যায় অবিচার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের আহ্বান এবং বিপন্ন ও মুক্তির পক্ষে সংগ্রামে একাত্মতার ঘোষণা।

কৈশোরে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের ধ্বংস ও তান্ডবলীলা, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে মৃত্যু ও হাহাকার দেখে তিনি এত আলোড়িত হন যে, সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নির্যাতিত মানুষের জন্যে গভীর মমতা তাঁর কবিতায় বাণীরূপ পায়। 'ছাড়পত্র' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস' এবং অন্যান্য রচনা: 'মিঠেকড়া', 'অভিযান', 'হরতাল' ইত্যাদি। তিনি ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' নামে একটি বাক্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সুকান্তের পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়। তাঁর জন্ম ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়। ১৯৪৭খ্রিষ্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রতিভাবান এ কবির অকালমৃত্যু হয়।

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নাই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর।
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্তএকে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

শব্দার্থ ও টীকা

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ - এ বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ এ বয়সে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এদিক থেকে তাকে এক কঠিন সময়ের দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়।

স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি - অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে।

বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি - নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে।

আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা- দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পণ করে বলে এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাববৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য	-	দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ড়বিপদ মোকাবেলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য। দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে।
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে	-	তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্ক্ষায়নে, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে সে এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে।
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা	-	চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ড়তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর	-	অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সেই মানুষের জীবনে বিশেষ প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়াও হয় গভীর।
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা	-	ভালোমন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে শুর“করে এই বয়সের তরুণেরা।
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার	-	জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে	-	সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারার অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস এ বয়সের নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে আছে।
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে	-	এ বয়স দেহ ও মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে পথ চলতে। প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্ড়ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য।
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে	-	আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত। জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি-এসবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। কবি প্রার্থনা করেন, এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

উৎস ও পরিচিতি

সুকান্ড়ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। মাত্র একুশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল সুকান্ড়। ধারণা করা হয়, আঠারো বছর বয়সে পদার্পণের আগেই কিংবা আঠারো বছর বয়সে কবি এ কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

এ কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেবার। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার।

এ বয়সের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাশাপাশি সমাজজীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতে এ বয়স আবার হয়ে উঠতে পারে ভয়ঙ্কর। বিকৃতি ও বিপর্যয়ের অজস্র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও নিঃশেষিত হতে পারে সহস্র প্রাণ।

কিন্তু অদম্য এ বয়সের আছে সমস্ড়দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবেলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণব্রত-এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপীড়িত আমাদের দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ছন্দ

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রতি চরণে মাত্রাসংখ্যা ১৪ (৬ + ৬ + ২)।

অনুশীলনমূলক কাজ

কবিতার মর্মার্থ উপলব্ধি ❑ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

জগতে সমস্ড়কিছুরই দুটি বিপরীত দিক রয়েছে। যেমন: ভাল-মন্দ, উত্তর-দক্ষিণ, হাসি-কান্না, জয়-পরাজয়, সুন্দর-কুৎসিত, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি। আমরা যখন কোনো কিছু সম্পর্কে ধারণা পোষণ করি তখন তার ভাল ও মন্দ দুটো দিক আমাদের বিচার করে দেখতে হয়।

তারুণ্যের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো আমরা মানবজীবনে শুভ ও মঙ্গলজনক বলে মনে করি। এসব দিককে আমরা বলতে পারি ইতিবাচক দিক। আবার তারুণ্যের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা সমাজের জন্য ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। এসব দিককে আমরা বলতে পারি নেতিবাচক দিক।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিক সম্পর্কে কবি নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন কি?

কবিতার শৈলী ❑ পুনরাবৃত্তি

এ কবিতায় 'আঠারো বছর বয়স' এবং 'এ বয়সে' কথাটি নানাভাবে এসেছে। কখনও 'আঠারো বছর বয়স' কথাটি এসেছে স্ড়কের শুরুতে, কখনও বা স্ড়কের শেষে, কখনও তা স্ড়কের অন্য চরণেও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ স্ড়ক লক্ষ করলে এ ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যবহার তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

তেমনি 'এ বয়সে' কথাটিও বিভিন্ন স্ড়কে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

কখনও কেবল চরণের শুরুতে:

এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

কখনও চরণের শুরুতে, মধ্যে বা সর্বত্রঃ

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-

বক্তব্যকে অধিকতর স্পষ্ট, আবেগময়, জোরালো কিংবা বিস্তৃত করার জন্যই কবিতায় এ ধরনের পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। এর ফলে কবিতা অধিকতর আবৃত্তিযোগ্য হয়ে ওঠে।

❑ ভাষা অনুশীলন

সন্ধিতে বিসর্গ স্থলে রেফ (র্)

দুঃ-উপসর্গের পর 'স' থাকলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় থাকে। কিন্তু 'ব' বা 'য' থাকলে বিসর্গের বদলে রেফ হয়।

দুঃ + সহ = দুঃসহ দুঃ + সাহস = দুঃসাহস	**এ রকমঃ** দুঃসংবাদ, দুঃসময়, দুঃসাধ্য ইত্যাদি।
দুঃ + বার = দুর্বার দুঃ + যোগ = দুর্যোগ	**এ রকমঃ** দুর্বিনীত, দুর্বিষহ, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি।

ব্যুৎপত্তি নির্দেশ

বছর	<	বৎসর
মাথা	<	মস্তক
সঁপা	<	সমর্পণ
ঝড়	<	ঝঞ্ঝা
নুতন	<	নূতন

বানান সতর্কতা

স্পর্ধা, স্টিমার, আত্মা, ভয়ংকর, তীব্র, মন্ত্রণা, ক্ষত-বিক্ষত, দীর্ঘশ্বাস, জয়ধ্বনি, অগ্রণী, ভীরু, সংশয়।

উচ্চারণ সতর্কতা

দুঃসহ (দুশ্শহো),	বছর (বছোর্)
দুঃসাহস (দুশ্শাহোস্),	বয়স (বয়োশ্)
শূন্য (শুন্নো),	ক্ষত-বিক্ষত (খতোবিক্খতো)
শপথ (শপোথ্),	লক্ষ (লোক্খো)
অসহ্য (অশোজ্ঝো),	জয়ধ্বনি (জয়োদ্ধোনি)
তীব্র (তিব্ব্রো),	সংশয় (শঙ্শয়্)
প্রখর (প্রোখর্)।	

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আঠারো বছর বয়সে কী নেই?

ক. মন্ত্রণা খ. কান্না

গ. যন্ত্রণা ঘ. পদস্খলন

২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে-

ক. শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব খ. সময়ের প্রতিচ্ছবি

গ. শোষণ-বঞ্চনায় বিদ্রোহ ঘ. তারুণ্যের অমিত সম্ভাবনা

৩. নিচের কোন শব্দগুচ্ছ প্রত্যয়ী আঠারো বছর বয়সের ধারক?

ক. কল্পনা, পরনির্ভরশীলতা ও উদ্যোগ

খ. দুর্বিনীত, বলীয়ান ও সংবেদনশীলতা

গ. দীর্ঘশ্বাস, সাহসিকতা ও উজ্জীবন

ঘ. পদস্খলন, দুঃসাহসী স্বপ্ন ও প্রাণবান

৪. কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি। সুকান্ত ভট্টাচার্য কিশোর কবি। উভয়ের মধ্যে মিলটি তাঁদের-

i. কাব্যাদর্শে

ii. শ্রেণীচেতনায়

iii. প্রতিভার ব্যাপ্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

কবিতার অংশ দু'টি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে।
****
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।

৫. কবিতার অংশ দু'টির উলিপ্পিত ভাবটি নিচের কোন পঙক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা

খ. এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

গ. এ বয়স যেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ লতে এ বয়স যায় না থেমে

ঘ. আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত একে একে হয় জড়ো।

৬. কবিতাংশে আঠারো বছর বয়সের কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে ?

ক. অন্ধকারের হাতছানি　　খ. ব্যর্থতার কষ্ট

গ. সাহসী গতিশীল　　ঘ. আঘাতে জর্জরিত

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা
****
ওই যে, প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

খ. আঠারো বছর বয়সের জীবনবোধকে কবি কেন তীব্রতা ও প্রখরতার সাথে তুলনা করেছেন?

গ. কবিতাংশ দুটিতে কী বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজের দুরবস্থা লাঘবে দ্বিতীয় কবিতাংশটি কতটুকু সহায়ক বলে তুমি মনে কর? 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. **দুজন মনোবিজ্ঞানীর মতবাদ :**

সিগমন্ড ফ্রয়েড : ১৬-১৮ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা সমলিঙ্গীয় প্রেমের আসক্তিতে ভোগে। স্বীয় সৌন্দর্য ও পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন হয়ে ওঠে এ বয়সেই (সাইকো-এনালাইটিক তত্ত্ব)।

এরিক-এরিকসন : ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের স্কুটি না শিশু না যুবক। এ বয়সে স্বীয় চিন্তার চেয়ে সমাজ চিন্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিবাদীও হয়ে ওঠে এ বয়সীরাই। আবার সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধাচারণ করে এ বয়সেই (সাইকো-সোস্যাল তত্ত্ব)।

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. কবি আঠারো বছর বয়সকে দুঃসহ বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবির মনোভাবের সাথে সিগমন্ড ফ্রয়েডের বক্তব্যের বৈপরিত্যটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবির দৃষ্টিভঙ্গি যেন এরিক-এরিকসনের বক্তব্যের প্রতিফলন-বিশ্লেষণ কর।

একটি ফটোগ্রাফ

শামসুর রাহমান

কবি-পরিচিতি

বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের কবিতা দেশপ্রেম ও সামাজিক সচেতনায় সতেজ ও দীপ্ত। নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলন তাঁর কবিতায় রূপায়িত হয়েছে বিচিত্র সংবেদনশীলতায়।

কর্মজীবনে শামসুর রাহমান ছিলেন সাংবাদিক। বিভিন্ন সময়ে তিনি 'মর্নিং নিউজ', 'দৈনিক বাংলা' ইত্যাদিতে সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় এক দশক ধরে তিনি ছিলেন ' দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক।

এ পর্যন্ড়তাঁর চলিশ্চটিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ড় ছোটদের জন্য কবিতা ও ছড়া রচনাতেও তাঁর সাফল্য উলেশ্চযোগ্য। এছাড়া তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথাও লিখেছেন।

কবির উলেশ্চযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'এক ফোঁটা কেমন অনল', 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিধ্বস্ড়ীলিমা', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দী শিবির', 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে', 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়', 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ইত্যাদি।

শামসুর রাহমানের পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাড়াতলী গ্রামে। তাঁর জন্ম ঢাকায় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৭ আগষ্ট ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে।

'এই যে আসুন, তারপর কী খবর?
আছেন তো ভালো? ছেলেমেয়ে?' কিছু আলাপের পর
দেখিয়ে সফেদ দেয়ালের শান্ড়ফটোগ্রাফটিকে
বললাম জিজ্ঞাসু অতিথিকে–
'এ আমার ছোট ছেলে, যে নেই এখন,
পাথরের টুকরোর মতন
ডুবে গেছে, আমাদের গ্রামের পুকুরে
বছর-তিনেক আগে কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।'

কী সহজে হয়ে গেল বলা,
কাঁপলো না গলা
এতটুকু, বুক চিরে বেরুলো না দীর্ঘশ্বাস, চোখ ছলছল
করলো না এবং নিজের কণ্ঠস্বর শুনে
নিজেই চমকে উঠি, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল।

তিনটি বছর মাত্র তিনটি বছর
কত উর্ণাজাল বুনে
কেটেছে, অথচ এরই মধ্যে বাজখাঁই
কেউ যেন আমার শোকের নদীটিকে কত দ্রুত রুক্ষ চর
করে দিলো। অতিথি বিদায় নিলে আবার দাঁড়াই
এসে ফটোগ্রাফটির মুখোমুখি প্রশ্নাকুল চোখে,
ক্ষীয়মাণ শোকে।

ফ্রেমের ভেতর থেকে আমার সন্তান
চেয়ে থাকে নিষ্পলক, তার চোখে নেই রাগ কিংবা অভিমান।

শব্দার্থ ও টীকা

সফেদ	-	সাদা।
ফটোগ্রাফ	-	আলোকচিত্র।
জিজ্ঞাসু	-	জানতে চায় এমন, কৌতূহলী।
নিস্পৃহ	-	অনাসক্ত।
তিনটি বছর মাত্র তিনটি বছর	-	পুত্রের মৃত্যুর পর অতিক্রান্ত তিনটি বছরের স্মৃতির বেদনাময় আর্তি এখানে আবেগময় হয়ে উঠেছে।
উর্ণাজাল	-	মাকড়সার সুতোয় তৈরি জাল। এখানে পুঞ্জীভূত স্মৃতি অর্থে।
কত উর্ণাজাল বুনে কেটেছে	-	অজস্র স্মৃতি মন্থন করে কাল কাটিয়েছেন।
বাজখাঁই	-	উচ্চ ও কর্কশ। গায়ক বাজ খাঁ বা বাজ বাহাদুরের কণ্ঠের অনুরূপ। এখানে রুক্ষকঠিন অর্থে ব্যবহৃত।
শোকের নদীটিকে কত দ্রুত রুক্ষ চর করে দিল	-	এ চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে শোকের অবসান হওয়া বোঝাতে।
প্রশ্নাকুল চোখে	-	কাতর ও অধীর জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে।
ক্ষীয়মান	-	হ্রাস পাচ্ছে এমন, ক্ষয়িষ্ণু।
ফ্রেমের ভেতর	-	যে সন্তান ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত সে নেই। অন্তরে তার স্মৃতি ক্ষীয়মাণ। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটিও তার অস্তিত্বের স্মৃতি।
নিষ্পলক	-	পলকহীন, চোখের পাতা না ফেলে।

উৎস ও পরিচিতি

শামসুর রাহমানের 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে তাঁর 'এক ফোঁটা কেমন অনল' কাব্যগ্রন্থ থেকে। এ কবিতায় মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে অনুভব করা হয়েছে সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে।

একদা পুত্রশোকে কাতর পিতা তিন বছর পর হঠাৎ অনুভব করলেন ঘরের সাদা দেওয়ালে ঝোলানো মৃত পুত্রের ফট্রোগ্রাফটি দেখিয়ে নিরাবেগ নিরাসক্ত কণ্ঠে অবলীলায় তিনি অতিথি বন্ধুকে বলে যেতে পারলেন পুত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি, কিন্তু নিস্পৃহ শীতল কণ্ঠে সংবাদের মত করে কথাটি বলার পরই তাঁর বুক আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। তিনি অবাক হন কীভাবে মাত্র তিনটি বছরের ব্যবধানে তার হৃদয়ের শোকের ও বেদনার নদী শুকিয়ে যেতে পারল।

কীভাবে পুত্রশোক ভুলে যেতে পারলেন- এই বেদনাময় জিজ্ঞাসা নিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো ফটোগ্রাফটির দিকে তাকান তিনি। কিন্তু দেওয়ালে পুত্রের ছবিতে কেবল নিরভিমান নিস্পলক দৃষ্টি।

যে প্রিয়জন একদা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ড়মৃত্যুতে তার জীবন্ড়অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। দেয়ালের ছবিতে থাকে তার নিরাবেগ অস্তিত্ব। কিন্তু তার সজীব স্মৃতি থাকে অন্স্ক জুড়ে। কালের নিষ্ঠুরতা প্রিয়জনের শোকময় স্মৃতি মনে থেকে মুছে ফেলতে চায়, কিন্তু সংবেদনশীল মন থেকে তা কিছুতেই মুছে দেওয়া যায় না।

ছন্দ

কবিতাটি মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। চরণ ৮, ১০ ও ৬ মাত্রার। পর্ব বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। সর্বত্র চরণান্স্ক মিল রক্ষিত হয়নি। ছন্দের প্রবাহমানতাও লক্ষণীয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কবিতা উপলব্ধি

১. প্রথম স্ক্তক সংলাপধর্মী এবং কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে তথ্য।

২. দ্বিতীয় স্ক্তকে আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে পিতৃহৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। পিতা যদিও অনুভব করছেন শোক ক্ষীয়মান এবং আপাতত এ শোক ভুলে থাকা যায় বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ শোক ভোলা যায় না।

৩. শেষ স্ক্তকে ফ্রেমে বাঁধা পুত্রের ছবির নির্বিকারত্ব নিষ্ঠুর ও কঠিন বাস্ক্তকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সজীব প্রাণবন্ড়পুত্র যে ছিল সে আর নেই। কিন্তু এ বাস্ক্তার কাঠিন্যের বিপরীতে কবির অন্ড়র হাহাকার যেন আরও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

উপমা

১. পাথরের টকুরোর মতন
ডুবে গেছে

চিত্রকল্প

১. পাথরের টুকরোর মতন
ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে।

২. কত ঊর্ণাজাল বুনে
কেটেছে।

৩. এরই মধ্যে বাজখাঁই
কেউ যেন আমার শোকের নদীটিকে কত দ্রুত রুক্ষ চর করে দিলো।

৪. ফ্রেমের ভেতর থেকে আমার সন্তান
চেয়ে থাকে নিষ্পলক,

ভাষা অনুশীলন

বিশেষণবাচক-'কী'

কী-শব্দটির একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে বিশেষণ হিসেবে এর ব্যবহার।

যেমন: 'এটি ফটোগ্রাফ' কবিতায়:

১. এই যে আসুন, তারপর কী খবর?

২. নিজেই চমকে উঠি, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল।

'কী' বিশেষণের বিশেষণ কিংবা ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, একই কবিতায় : কী সহজে হয়ে গেল বলা।

বিশেষণ শব্দ :

<u>সফেদ</u> দেয়াল

<u>শান্ত</u> ফটোগ্রাফ

<u>জিজ্ঞাসু</u> অতিথি

<u>ছোট</u> ছেলে

<u>নিস্পৃহ</u> কণ্ঠস্বর

<u>তিনটি</u> বছর

<u>রুক্ষ</u> চর

<u>প্রশ্নাকুল</u> চোখ

<u>ক্ষীয়মাণ</u> শোক

বিশেষণ সম্বন্ধ :

পাথরের টুকরো

আমাদের গ্রামের পুকুর

গ্রীষ্মের দুপুর

শোকের নদী

আমার সন্তান

ক্রিয়া বিশেষণ :

সহজে হয়ে গেল বলা।

❑ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফটোগ্রাফটি সম্পর্কে কে জানতে চেয়েছিলো?

ক. প্রতিবেশি   খ. অতিথি

গ. আত্মীয়   ঘ. বাড়িওয়ালা

২. উর্ণাজাল বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

ক. পুঞ্জীভূত স্মৃতি   খ. উড়ন্তজাল

গ. মাকড়সার জাল   ঘ. দুঃখ-কাতরতা

৩. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার প্রথম স্তবকটি-

i. বর্ণনাধর্মী

ii. সংলাপধর্মী

iii. চিত্রধর্মী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

কবিতাংশটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

"এ যেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,

বাক্যহীন পুত্র শোকে! ঝর ঝর ঝরে

অবিরল অশ্রুধারা-তিতিরা বসনে,

যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে

বাজিলে কাঁদে নীরবে।"

৪. রক্ষ : কুলপতি একটি ফটোগ্রাফ কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?

ক. অতিথি   খ. মৃতপুত্র

গ. পিতা   ঘ. বাজ খাঁ

৫. 'পুত্র শোকে বাক্যহীন' এবং 'ক্ষীয়মাণ শোক'-পুত্রহারা দুই পিতার ভিন্ন অবস্থার কারণ কী?

ক. বয়সের পার্থক্য   খ. সময়ের ব্যবধান

গ. পেশাগত ভিন্নতা   ঘ. ভৌগোলিক দূরত্ব

http://zoaddar.org

❑ সৃজনশীল প্রশ্ন

১. চিঠিটা তার পকেটে ছিলো
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।
****
মা পড়ে আর হাসে,
"তোর ওপর রাগ করতে পারি।"
নারকেলের চিড়ে কোটে,
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে
এটা-সেটা আরো কত কী।
তার খোকা যে বাড়ি ফিরবে।
ক্লান্ত খোকা।

ক. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কার লেখা?

খ. কবিতায় 'বাজখাঁই' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুচ্ছেদের চিঠি এবং 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার ফটোগ্রাফের সাযুজ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রতীক্ষারত মা এবং পুত্রহারা পিতার অনুভূতির তুলনা কর।

২. একটি দলিল খুঁজতে গিয়ে আজম সাহেবের চোখে পড়ে জীর্ণ-মলিন সার্টিফিকেটটি। তাঁরই ছেলে মুকুলের এসএসসি পাশের সনদ; যে মারা গেছে সড়ক দুর্ঘটনায় বছর পাঁচেক আগে। তখন সবাই ভেবেছিলো এত আদরের পুত্র হারাবার শোক সহ্য করতে পারবেন না আজম সাহেব। কিন্তু সময়ের হাত ধরে স্মৃতির জানালা থেকে দূরে সরে গেছে মুকুলের মুখ। মৃত পুত্রের সার্টিফিকেটটি অকেজো বিবেচনায় মুচড়ে ফেলে দেন আজম সাহেব।

ক. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা?

খ. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতায় পুত্রের মৃত্যুর প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা কর।

গ. আজম সাহেব এবং একটি ফটোগ্রাফ কবিতায় পুত্রহারা পিতার মাঝে কী বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সময়ের হাত ধরে স্মৃতির জানালা থেকে দূরে সরে গেছে মুকুলের মুখ' আজম সাহেবের এই অনুভূতির আলোকে কবিতাটির ভাববস্তু বিশেষণ কর।

২০১১ সনে
সংশোধিত পরিমার্জিত

মূল পাঠ্যপুস্তকের সংযুক্তি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা